Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজার গুরুত্ব, ফজিলত,প্রয়োজনীয় মাসআলা,মাসায়েল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শামছুন নাহার

রোলঃ 23090120367

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজার গুরুত্ব, ফজিলত,প্রয়োজনীয় মাসআলা,মাসায়েল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শামছুন নাহার

রোলঃ 23090120367

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " রোজার গুরুত্ব, ফজিলত,প্রয়োজনীয় মাসআলা,মাসায়েল " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শামছুন নাহার, আইডিঃ 23090120367 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " রোজার গুরুত্ব, ফজিলত,প্রয়োজনীয় মাসআলা,মাসায়েল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Shamsun Nahar

(স্বাক্ষর)

শামছুন নাহার

আইডিঃ 23090120367

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা: 5

রোজার ফজিলত: 7

রোযার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, উপকারিতা ও যৌক্তিকতা 18

রোযার প্রকারভেদ 31

রমাযান মাসের বৈশিষ্ট্য ও তার রোযার মাহাত্ম্য 32

বিনা ওযরে রোযা ত্যাগ করার সাজা 36

জ্যোতিষ-গণনার উপর নির্ভর করা যাবে নাঃ 38

চাঁদ দেখার জন্য দুরবীন ব্যবহারঃ 39

উদয়স্থলের বিভিন্নতাঃ 40

রোযার মাসায়েল 42

কাফফারা আদায়ের নিয়ম 48

রামাযানের তাৎপর্য : 59

রামাযানের শিক্ষা 60

উপসংহার: 62

ভূমিকা:

ইসলামের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হলো রোজা, যা আত্মশুদ্ধি, তাকওয়া ও ধৈর্য অর্জনের এক শক্তিশালী মাধ্যম। রমজান মাসে রোজা রাখা প্রতিটি সক্ষম মুসলিমের জন্য ফরজ বা বাধ্যতামূলক। এই মাসে একটি নেক আমলের সওয়াব ৭০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং নফল ইবাদতের সওয়াব অন্য মাসের ফরজ ইবাদতের সমান হয়। রোজার মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করা, যা একজন মানুষকে আল্লাহর কাছাকাছি নিয়ে আসে। রোজা শুধু একটি ইবাদতই নয়, এটি মানবজাতির মধ্যে সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধনকেও সুদৃঢ় করে।

ইসলামী শরীয়তে রোযা ও তার পর্যায়ক্রম

মহাবিজ্ঞান ও হিকমতময় মহান আল্লাহর একটি হিকমত ও অনুগ্রহ এই যে, তিনি বান্দার উপর যে আদেশ-নিষেধ আরোপ করেছেন তার মধ্যে বহু বিষয়কেই পর্যায় অনুক্রমে ধীরে ধীরে ফরয অথবা হারাম করেছেন। অনুরূপ তাঁর এক ফরয হল সিয়াম বা রোযা। যা তিনি উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর পর্যায়ক্রমে কিছু কিছু করে ফরয করেছেন। যেমনঃ-

প্রথম পর্যায়ঃ-

প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক মাসে ৩টি করে রোযা পালন করতেন। আর এ দেখে সাহাবাগণও (রাঃ) তাঁর অনুসরণে ঐ রোযা রাখতেন। যাতে করে রোযার অভ্যাস তাদের জন্য সহজ হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ-

কুরাইশদল জাহেলী যুগে আশূরার রোযা রাখত।[1] অতঃপর তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদ্বীনায় এলে মূসা u-এর অনুকরণে তাঁর স্মৃতি পালন করে আশূরার দিনে খুব গুরুত্বের সাথে রোযা রাখলেন এবং সাহাবাদেরকেও এ রোযা রাখতে আদেশ করলেন। তখন এ রোযা রাখা ফরয ছিল।

তৃতীয় পর্যায়ঃ-

অতঃপর রোযার বিধান নিয়ে কুরআন কারীমের উপর্যুক্ত আয়াত অবতীর্ণ হল। কিন্তু শুরুতে তখনও রোযা পূর্ণ আকারে ফরয ছিল না। যার ইচ্ছা সে রোযা রাখত এবং যার ইচ্ছা সে না রেখে মিসকীনকে খাদ্য দান করত। তবে রোযা রাখাটাই আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় ছিল। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর নির্দেশ ছিলঃ-

(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)

অর্থাৎ, যারা রোযা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখতে চায় না, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য

কল্যাণকর হয়। আর যদি তোমরা রোযা রাখ, তাহলে তা তোমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণপ্রসূ; যদি তোমরা উপলব্ধি করতে পার। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৪)

চতুর্থ পর্যায়ঃ-

অতঃপর সন ২ হিজরীর শা'বান মাসের ২য় তারীখ সোমবারে ([2]) প্রত্যেক সামর্থ্যবান ভারপ্রাপ্ত মুসলিমের পক্ষে পূর্ণ রমাযান ([3]) মাসের রোযা ফরয করা হল। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)

অর্থাৎ, রমাযান মাস; যে মাসে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে রোযা রাখে। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৫)

সুতরাং সামর্থ্যবান ভারপ্রাপ্ত (জ্ঞানসম্পন্ন সাবালক) গৃহবাসীর জন্য মিসকীনকে খাদ্যদানের বিধান রহিত হয়ে গেল এবং বৃদ্ধ ও চিররোগীর জন্য তা বহাল রাখা হল। অনুরূপ (কিছু উলামার মতে) এ বিধান গর্ভবতী ও দুগ্ধদাত্রী মহিলার জন্যও বহাল করা হল; যারা গর্ভকালে বা দুগ্ধদান কালে রোযা রাখলে তার সন্তানের বিশেষ ক্ষতি হবে বলে আশঙ্কা করে।

মুসলিমদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ রহমত এই ছিল যে, রোযার বহু কষ্টভার তিনি লাঘব করে দিয়েছেন। যেমন; শুরুর দিকে এ রোযা ফরয ছিল এশার নামায বা রাত্রে ঘুমিয়ে যাওয়ার পর থেকে পর দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত। অর্থাৎ, রাত্রে একবার ঘুমিয়ে পড়লে পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস হারাম হয়ে যেত। এতে মুসলিমরা বড় কষ্টবোধ করতে লাগলেন। সময় লম্বা থাকার কারণে তাঁরা বড় দুর্বল হয়ে পড়তেন। অতঃপর মহান আল্লাহর তরফ থেকে সে ভার হাল্কা করা হল। পরিশেষে ফজর উদয়কাল থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত কাল পর্যন্ত হল রোযা রাখার সময়।

আনসার গোত্রের সিরমাহ নামক এক ব্যক্তি রোযা রাখা অবস্থায় সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করতেন। একদিন তিনি বাড়ি ফিরে এসে এশার নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়লেন এবং কোন প্রকার পানাহার না করেই তাঁর ফজর হয়ে গেল। সুতরাং এ অবস্থাতেই পরদিন রোযা রাখলেন। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাঁকে সেই কঠিন দুর্বল ও ক্লিষ্ট অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ব্যাপার! আমি তোমাকে বড় দুর্বল দেখছি যে?" তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি গতকাল কাজ করার পর যখন এলাম তখন এলাম। তারপর (পরিশ্রান্ত হয়ে) শুয়ে পড়তেই ঘুমিয়ে গেলাম। তারপর ফজর হয়ে গেলে আবার রোযা রেখে নিলাম।'[4]

উমার (রাঃ) এক রাত্রে ঘুমিয়ে যাওয়ার পর উঠে স্ত্রী-মিলন করে ফেললেন। তিনি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে ঘটনা উল্লেখ করলেন। অতঃপর এই সবের পরিপ্রেক্ষীতে আল্লাহর বিধান অবতীর্ণ হল,

(أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)

অর্থাৎ, রোযার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পোষাক এবং তোমরা তাদের পোষাক। আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা আত্ম-প্রতারণা করছ। তাই তো তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতএব এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা (সন্তান, শবেকদর, সকল বৈধ বস্তু বা আল্লাহর তরফ থেকে কোন কিছুর ব্যাপারে অব্যাহতি) লিখে রেখেছেন তা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর; যতক্ষণ রাত্রির কালো রেখা হতে ফজরের সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রকাশ না পায়। অতঃপর রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর।(কুরআনুল কারীম ২/১৮৭) [5]2] ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩৮৩ দ্রঃ

[3] রমাযান কথাটি আরবী রামাযান-এর অপভ্রংশ ও বাংলায় চলিত রূপ।

[4] (বুখারী ১৯১৫, সহীহ আবূ দাঊদ ২০২৯নং)

[5] (সহীহ আবূ দাঊদ ২০২৮নং, তাফসীর ইবনে কাসীর ১/২৯১, আহকামুস সাওমি অল-ই'তিকাফ, আবূ সারী মঃ আব্দুল হাদী ২৩-২৫পৃঃ দ্রঃ)
শাবান-রমযান-১৪৩৩ || জুল

রোজার ফজিলত:

- **সওয়াব বৃদ্ধি:** রমজান মাসে প্রতিটি নেক কাজের সওয়াব ৭০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।
- **ক্ষমা ও নাজাত:** রমজানের প্রথম ১০ দিন রহমত, দ্বিতীয় ১০ দিন মাগফিরাত এবং শেষ ১০ দিন নাজাতের জন্য নির্ধারিত।
- **জান্নাত লাভ:** রোজার মাধ্যমে জান্নাতের 'রাইয়ান' নামক বিশেষ দরজা দিয়ে প্রবেশের সুযোগ লাভ করা যায়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত রোযার কিছু ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা হলো :

১. রোযার প্রতিদান আল্লাহ রাববুল আলামীন নিজেই দিবেন এবং বিনা হিসাবে দিবেন

প্রত্যেক নেক আমলের নির্ধারিত সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমলকারীকে পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু রোযার বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ রোযার বিষয়ে আছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এক অনন্য ঘোষণা।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى : الا الصوم فإنه لى وانا أجزى به يدع شهوته وطعامه من أجلى.

মানুষের প্রত্যেক আমলের প্রতিদান বৃদ্ধি করা হয়। একটি নেকীর সওয়াব দশ গুণ থেকে সাতাশ গুণ পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, কিন্তু রোযা আলাদা। কেননা তা একমাত্র আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর বিনিময় প্রদান করব। বান্দা একমাত্র আমার জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং পানাহার পরিত্যাগ করেছে।-সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫১ (১৬৪); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৭১৪; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৮৭; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৬৩৮

অন্য বর্ণনায় আছে-

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله : يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلى، الصيام لى وانا اجزى به، والحسنة بعشر امثالها.

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন, বান্দা একমাত্র আমার জন্য তার পানাহার ও কামাচার বর্জন করে, রোযা আমার জন্যই, আমি নিজেই তার পুরস্কার দিব আর (অন্যান্য) নেক আমলের বিনিময় হচ্ছে তার দশগুণ।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৮৯৪; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৯৯৯; মুয়াত্তা মালেক ১/৩১০

রোযা বিষয়ে-অন্য বর্ণনায়-আললাহ তাআলা বলেন, "প্রত্যেক ইবাদতই ইবাদতকারী ব্যক্তির জন্য, পক্ষান্তরে রোযা আমার জন্য। আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। (সহীহ বুখারী হাদীস-১৯০৪)

এ কথার তাৎপর্য হল, যদিও প্রকৃতপক্ষে সকল ইবাদতই আল্লাহর জন্য, তার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। তবুও রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। তা হল-অন্যান্য সকল ইবাদতের কাঠামোগত ক্রিয়াকলাপ, আকার-আকৃতি ও নিয়ম পদ্ধতি এমন যে, তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছাড়াও ইবাদতকারীর নফসের স্বাদ গ্রহণের সুযোগ বিদ্যমান থাকে। মুখে প্রকাশ না করলেও অনেক সময় তার অন্তরে রিয়া তথা লোক দেখানো ভাব সৃষ্টি হতে পারে। তার অনুভূতির অন্তরালে এ ধরনের ভাব লুকিয়ে থাকে। তা সে অনুভব করতে না পারলেও তার ভিতরে অবচেতনভাবে বিদ্যমান থাকে। ফলে সেখানে নফসের প্রভাব এসে যায়। পক্ষান্তরে রোযা এমন এক পদ্ধতিগত ইবাদত, তার-আকার-আকৃতি এরূপ যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত ইবাদতকারীর নফসের স্বাদ গ্রহণের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। রোযাদার ব্যক্তি নিজ মুখে রোযার বিষয়টি প্রকাশ না করলে সাধারণত তা আলেমুল গায়েব আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কারো নিকট প্রকাশিত হওয়ার মত নয়। তাই রোযার

ক্ষেত্রে মাওলার সন্তুষ্টির বিষয়টি একনিষ্ঠভাবে প্রতিভাত হয়। একারণেই রোযা ও অন্যান্য ইবাদতের মাঝে এরূপ বিস্তর ব্যবধান।

রোযার এত বড় ফযীলতের কারণ এটাও হতে পারে যে, রোযা ধৈর্য্যের ফলস্বরূপ। আর ধৈর্য্যধারণকারীদের জন্য আল্লাহ তাআলার সুসংবাদ হল-

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

ধৈর্য্যধারণকারীগণই অগণিত সওয়াবের অধিকারী হবে।-সূরা যুমার (৩৯) : ১০

সব মাখলুকের স্রষ্টা, বিশ্বজাহানের প্রতিপালক, আল্লাহ তাআলা নিজেই যখন এর পুরস্কার দিবেন, তখন কী পরিমাণ দিবেন? ইমাম আওযায়ী রাহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন- আল্লাহ যে রোযাদারকে প্রতিদান দিবেন, তা মাপা হবে না, ওজন করা হবে না অর্থাৎ বিনা হিসাবেই দিবেন।

২. আল্লাহ তাআলা রোযাদারকে কেয়ামতের দিন পানি পান করাবেন

হযরত আবু মুসা রা. হতে বর্ণিত,

ان الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من اعطش نفسه له في صائف سقاه يوم العطش، رواه البزار، وذكره الهيثمي في المجمع (5095)، وقال : رواه البزار، ورجاله موثقون. وقال المنذري في الترغيب (1478)، : إسناده حسن، ان شاء الله.

আল্লাহ রাববুল আলামীন নিজের উপর অবধারিত করে নিয়েছেন, যে ব্যক্তি তার সন্তুষ্টির জণ্য গ্রীষ্মকালে (রোযার কারণে) পিপাসার্ত থেকেছে, তিনি তাকে তৃষ্ণার দিন (কিয়ামতের দিন) পানি পান করাবেন।-মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ১০৩৯; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস : ৫০৯৫

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

قال الله تعالى : الصيام لى وانا اجزى به ... فان لهم يوم القيامة حوضا ما يرده غير الصائم، رواه البزار وذكره الهيثمي في المجمع، (5093)، وقال : رواه البزار، ورجاله موثقون.

আল্লাহ তাআলা বলেন, রোযা আমার জন্য, আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। কেয়ামতের দিন রোযাদারদের জন্য একটি বিশেষ পানির হাউজ থাকবে, যেখানে রোযাদার ব্যতীত অন্য কারো আগমন ঘটবে না।-মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ৮১১৫; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস : ৫০৯৩

৩. রোযা হল জান্নাত লাভের পথ

عن حذيفة رضي الله عنه قال : اسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، فقال : من قال : لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به، دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ختم له بها، دخل الجنة، رواه احمد، وذكره الهيثمى فى المجمع (11935) وقال : رواه احمد ورجاله رجال الصحيح غير عثمان بن مسلم البتى وهو ثقة، فالحديث صحيح كما قاله الشيخ احمد شاكر والشيخ شعيب الارنؤوط.

হযরত হুযায়ফা রা. বলেন, আমি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার বুকের সাথে মিলিয়ে নিলাম, তারপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে মৃত্যুবরণ করবে

সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় একদিন রোযা রাখবে, পরে তার মৃত্যু হয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো দান-সদকা করে তারপর তার মৃত্যু হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩৩২৪; মুসনাদে বাযযার, হা.২৮৫৪

عن أبي أمامة قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت : مرني بعمل يدخلني الجنة، قال : عليك بالصوم، فانه لا عدل له، ثم أتيته الثانية، فقال لي : عليك بالصيام.

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আগমন করে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যার দ্বারা আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বলেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা এর সমতুল্য কিছু নেই। আমি পুনরায় তার নিকট এসে একই কথা বললাম। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২১৪৯; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৮৯৩; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৪২৬; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৩০

৪. রোযাদারগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে 'রাইয়ান' নামক বিশেষ দরজা দিয়ে

হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা. হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إن فى الجنة بابا يقال له الريَّان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال : اين الصائمون فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فاذا دخلوا اغلق، فلم يدخل منه احد.

জান্নাতে একটি দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান। কিয়ামতের দিন এ দরজা দিয়ে কেবল রোযাদার ব্যক্তিরাই প্রবেশ করবে। অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা করা হবে- কোথায় সেই সৌভাগ্যবান রোযাদারগণ? তখন তারা উঠে দাড়াবে। তারা ব্যতীত কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। অতঃপর রোযাদারগণ যখন প্রবেশ করবে, তখন তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে কেউ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৮৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫২; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২৮১৮

হযরত সাহল ইবেন সা'দ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

ان للصائمين بابا فى الجنة يقال له : الريان، لا يدخل منه غيرهم اذا دخل آخرهم اغلق، ومن دخل منه شرب، ومن شرب منه لم يظمأ ابدًا.

قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريب.

জান্নাতে রোযাদার ব্যক্তিদের জন্য একটি বিশেষ দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান। রোযাদারগণ ছাড়া অন্য কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। যখন সর্বশেষ রোযাদার ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে, তখন সেই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, সে (জান্নাতের পানীয়) পান করবে। আর যে পান করবে, সে কখনো পিপাসার্ত হবে

না।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২৮৪২; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস : ১৯০২; সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৭৬৫; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৪৪

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لكل اهل عمل باب من ابواب الجنة يدعون منه بذلك العمل، ولاهل الصيام باب يدعون منه، يقال له : الريان، فقال أبو بكر : يا رسول الله، هل احد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال : نعم، وارجو أن تكون منهم يا ابا بكر،

প্রত্যেক প্রকারের নেক আমলকারীর জন্য জান্নাতে একটি করে বিশেষ দরজা থাকবে, যার যে আমলের প্রতি অধিক অনুরাগ ছিল তাকে সে দরজা দিয়ে আহবান করা হবে। রোযাদারদের জন্যও একটি বিশেষ দরজা থাকবে, যা দিয়ে তাদেরকে ডাকা হবে, তার নাম হবে 'রাইয়ান'। আবু বকর রা. বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমন কেউ কি হবেন, যাকে সকল দরজা থেকে আহবান করা হবে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি আশা রাখি তুমিও তাদের একজন হবে।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৮০০; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস : ৩২৬২৮

এ সম্পর্কে বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة : يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، فقال أبو بكر : بأبي أنت وأمي، يا رسول الله! ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال : نعم، وأرجو أن تكون منهم.

(সহীহ বুখারী, হাদীস-১৮৯৬, ৩৬৬৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০২৭ (৮৫-৮৬); মুসনাদে আহমাদ, হাদীস-৭৬৩৩; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস -৩০৯)

৫.রোযা জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল ও দুর্গ

হযরত জাবির রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

قال ربنا عز وجل : الصيام جنة يستجن بها العبد من النار وهو لى وانا أجزى به.
وهذا حديث صحيح بطرقه وشواهده، قاله الشيخ شعيب الارنؤوط

আমাদের মহান রব ইরশাদ করেছেন- রোযা হল ঢাল। বান্দা এর দ্বারা নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। রোযা আমার জন্য আর আমিই এর পুরস্কার দিব।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৪৬৬৯; শুয়াবুল ঈমান বাইহাকী, হাদীস : ৩৫৭০

উসমান ইবনে আবিল আস রা. বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

الصيام جنة من النار كجنة احدكم من القتال،

রোযা হল জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল, যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের (শত্রুর আঘাত হতে রক্ষাকারী) ঢালের মত।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৬২৭৮; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২১২৫; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৬৪৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৬৩৯

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الصيام جنة، وحصن حصين من النار

রোযা হল (জাহান্নাম থেকে পরিত্রান লাভের) ঢাল এবং সুরক্ষিত দুর্গ।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস-৯২২৫; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান, হাদীস-৩৫৭১

৬. রোযা কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام : اى رب منعته الطعام والشهوة فشفعنى فيه، ويقول القرآن : منعته النوم بالليل، فشفعنى فيه، قال : فيشفعان له.

رواه أحمد، والحاكم فى المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي فى المجمع، وقال : رواه أحمد والطبرانى فى الكبير، ورجال الطبرانى رجال الصحيح.

রোযা ও কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে রব! আমি তাকে খাদ্য ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত রেখেছি। অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছি, (অর্থাৎ না ঘুমিয়ে সে তেলাওয়াত করেছে) অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর তাদের উভয়ের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৬৬২৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস : ২০৮০; বাইহাকী শুয়াবুল ঈমান, হাদীস : ১৯৯৪

৭.রোযাদারের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।- সহীহ বুখারী, হাদীস : ৩৮, ২০১৪; সহীহ মুসলিম ৭৬০(১৬৫); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৭১৭০; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৬৮

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ان الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه، فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه.

আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর রমযানের রোযা ফরয করেছেন, আর আমি কিয়ামুল লাইল অর্থাৎ তারাবীহ’র নামাযকে সুন্নত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায়

রমযানের সিয়াম ও কিয়াম আদায় করবে, সে ঐ দিনের মতো নিষ্পাপ হয়ে যাবে যেদিন সে মায়ের গর্ভ থেকে সদ্যভূমিষ্ঠ হয়েছিল।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস-১৬৬০, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস-৭৭৮৭, মুসনাদে বাযযার, হাদীস-১০৪৮, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস-২২০১, সুনানে নাসায়ী, হাদীস-২৫১৮

৮. রোযা গুনাহের কাফফারা

রোযা গুনাহের কাফফারা হওয়া কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন প্রকার গুনাহের কাফফারা স্বরূপ রোযার বিধান নাযিল করেছেন। যেমন ইহরাম অবস্থায় (অসুস্থতা বা মাথার কষ্টের কারণে) মাথা মুন্ডানোর কাফফারা স্বরূপ (২:১৯৬), কোন যিম্মী বা চুক্তিবদ্ধ কাফেরকে ভুলক্রমে হত্যার কাফফারা স্বরূপ (৪:৯২), কসমের কাফফারা স্বরূপ (৫:৮৯) এবং যিহারের কাফফারা স্বরূপ (৫৮:৩-৪); আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন মেয়াদে রোযার হুকুম দেওয়া হয়েছে। তাই সহজেই বোধগম্য যে, রোযা বান্দার পাপসমূহকে ধুয়ে-মুছে রোযাদারকে পরিশুদ্ধ করে।

হযরত হুযায়ফা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

فتنة الرجل فى اهله وماله ونفسه وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

মানুষের জন্য তার পরিবার, ধন-সম্পদ, তার আত্মা, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশী ফিতনা স্বরূপ। তার কাফফারা হল নামায, রোযা, দান-সদকাহ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫২৫, ১৮৬৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৮৯২-২৬, মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩২৮০, সুনানে তিরমিযী, হা. ২২৫৮

৯. রোযাদারের মুখের গন্ধ মিশকের চেয়েও সুগন্ধিযুক্ত

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك،

সেই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫১ (১৬৩); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৭১৭৪; সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫২৩; সুনানে ইবনে মাজাহ- ১৬৩৮

১০.রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح، واذا لقى ربه فرح بصومه، وفى رواية : اذا لقى الله فجزاه فرح،

রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে, যখন সে আনন্দিত হবে। এক. যখন সে ইফতার করে তখন ইফতারের কারণে আনন্দ পায়। দুই. যখন সে তার রবের সাথে মিলিত হবে তখন তার রোযার কারণে আনন্দিত হবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন সে আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, আর তিনি তাকে পুরস্কার দিবেন, তখন সে আনন্দিত হবে।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৪, ১৮৯৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১৫১ (১৬৩, ১৬৪, ১৬৫); মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৯৪২৯, ৭১৭৪; সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৭৬৬

১১. রোযাদার পরকালে সিদ্দীকীন ও শহীদগণের দলভুক্ত থাকবে

হযরত আমর ইবনে মুররা আলজুহানী রা. হতে বর্ণিত,

جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله! أرايت ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس واديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال : من الصديقين والشهداء،

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি একথার সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং অবশ্যই আপনি আল্লাহর রাসূল, আর আমি যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, যাকাত প্রদান করি, রমযান মাসের সিয়াম ও কিয়াম (তারাবীহসহ অন্যান্য নফল) আদায় করি তাহলে আমি কাদের দলভুক্ত হব? তিনি বললেন, সিদ্দীকীন ও শহীদগণের দলভুক্ত হবে।-মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ২৫, সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ২২১২, সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৪২৯

১২.রোযাদারের দুআ কবুল হয়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد.

قال البوصيرى : اسناده صحيح.

ইফতারের সময় রোযাদার যখন দুআ করে, তখন তার দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। (অর্থাৎ তার দুআ কবুল হয়)।-সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৭৫

হযরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

ثلاثة لا ترد دعوتهم الامام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم، تحمل على الغمام، وتفتح لها ابواب السماوات، ويقول الرب عز وجل : وعزتى لانصرنك ولو بعد حين.

وقال الترمذى : هذا حديث حسن.

তিন ব্যক্তির দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না (অর্থাৎ তাদের দুআ কবুল করা হয়) ন্যায়পরায়ন শাসকের দুআ; রোযাদার ব্যক্তির দুআ ইফতারের সময় পর্যন্ত ও মজলুমের দুআ। তাদের দুআ মেঘমালার উপরে উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং এর জন্য সব আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। তখন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন, আমার ইয্যতের কসম! বিলম্বে হলেও অবশ্যই

আমি তোমাকে সাহায্য করব।-মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ৮০৪৩; সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৩৫৯৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৭৫২; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৩৪২৮

হযরত আবু হুরায়রা রা. র্বণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

الصائم لا ترد دعوته،
وهذا الحديث اسناده حسن قاله الشيخ محمد عوامة

রোযাদারের দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৮৯৯৫

১৩. রোযা হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেয়

صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر،
وقال المنذرى : ورجاله رجال الصحيح، ورواه احمد وابن حبان والبيهقى الثلاثة من حديث الأعرابى ولم يسموه، (اى ابن عباس)

হযরত ইবনে আববাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সবরের মাসের (রমযান মাস) রোযা এবং প্রতি মাসের তিন দিনের (আইয়্যামে বীয) রোযা অন্তরের হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেয়। -মুসনাদে বাযযার, হাদীস : ১০৫৭; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৩০৭০; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : ৬৫২৩

১৪.আল্লাহর নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম

عن أبى أمامة قال : قلت يا رسول الله! مرنى بعمل قال : عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت : يا رسول الله! مرنى بعمل قال : عليك بالصوم، فانه لا عدل له.

আমাকে কোনো !ইয়া রাসূলাল্লাহ ,আমি বললাম ,আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন হযরত কিছু সমতুল্য কেননা এর ,তুমি রোযা রাখ ,তিনি বললেন করুন। আদেশ আমলের কথা আমলের আমাকে কোনো নেক !ইয়া রাসূলাল্লাহ ,আমি পুনরায় বললাম নেই। সহীহ-কিছু নেই। কোনো সমতুল্য কেননা এর ,তুমি রোযা রাখ ,তিনি বললেন ,বলুন ইবনে হাদীস : ২২১৪০; সহীহ ,ইবনে খুযাইমা, হাদীস : ১৮৯৩; মুসনাদে আহমদ عن أبى أمامة الباهلى হাদীস : ৩৪২৫; সুনানে নাসায়ী কুবরা, হাদীস : ২৫৩৩ ,হিববান قال : قلت يا رسول الله مرنى بأمر ينفعنى الله به، قال : عليك بالصوم فانه لا مثل له.
هذا حديث اسناده صحيح على شرط مسلم قاله الشيخ شعيب وكذا قاله الشيخ أحمد شاكر.

হযরত আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোনো আমলের আদেশ করুন, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা আমাকে উপকৃত করবেন। তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ, কেননা তার তুলনা হয় না।-সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২৫৩১; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২১৪১; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ৩৮৯৩ তাবারানী, হাদীস : ৭৪৬৩

রমযান হল খালেস ইবাদতের মৌসুম। তাই এ মাসের সময়গুলো যতটা শুধু আল্লাহর সাথে কাটানো যায় ততটা ভালো। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে হাদীস অনুযায়ী আমল করার

ও উক্ত ফযীলত লাভ করার তাওফীক দান করুন। আমীন। ইয়া রাববাল আলমীন

সাধারণভাবে রোযার ফযীলত বর্ণনা করে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কতিপয় সহীহ হাদীস প্রণিধানযোগ্যঃ-

১। আবু হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ''আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক আমল তার নিজের জন্য; তবে রোযা নয়, যেহেতু তা আমারই জন্য এবং আমি নিজেই তার প্রতিদান দেব।' রোযা ঢাল স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের কারো রোযার দিন হলে সে যেন অশ্লীল না বকে ও ঝগড়া-হৈচৈ না করে; পরন্তু যদি তাকে কেউ গালাগালি করে অথবা তার সাথে লড়তে চায়, তবে সে যেন বলে, 'আমি রোযা রেখেছি, আমার রোযা আছে।' সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ আছে! নিশ্চয়ই রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর নিকট কস্তুরীর সুবাস অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধময়। রোযাদারের জন্য রয়েছে দু'টি খুশী, যা সে লাভ করে; যখন সে ইফতার করে তখন ইফতারী নিয়ে খুশী হয়। আর যখন সে তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তার রোযা নিয়ে খুশী হবে।[1]

২। হুযাইফা (রাঃ) বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, ''মানুষের পরিবার, ধন-সম্পদ ও প্রতিবেশীর ব্যাপারে ঘটিত বিভিন্ন ফিতনা ও গোনাহর কাফ্ফারা হল নামায, রোযা ও সদকাহ।''[2]

৩। সাহ্ল বিন সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, জান্নাতের এক প্রবেশদ্বার রয়েছে, যার নাম 'রাইয়ান।' কিয়ামতের দিন ঐ দ্বার দিয়ে রোযাদারগণ প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া তাদের সাথে আর কেউই ঐ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে না। বলা হবে, 'কোথায় রোযাদারগণ?' সুতরাং তারা ঐ দরজা দিয়ে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে। অতঃপর যখন তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি প্রবেশ করবে, তখন সে দ্বার রুদ্ধ করা হবে। ফলে সে দ্বার দিয়ে আর কেউই প্রবেশ করতে পারবে না।''[3]

৪। আবু হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ''--- আর যে ব্যক্তি রোযা রাখায় অভ্যাসী হবে, তাকে (কিয়ামতের দিন) 'রাইয়ান' দুয়ার হতে (জান্নাতের দিকে) আহবান করা হবে। ---''[4]

৫। আবু সাঈদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'যে বান্দা আল্লাহর রাস্তায় একদিন মাত্র রোযা রাখবে সেই বান্দাকে আল্লাহ ঐ রোযার বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে ৭০ বছরের পথ পরিমাণ দূরত্বে রাখবেন।''[5]

৬। আম্র বিন আবাসাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ''যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন মাত্র রোযা রাখবে সেই ব্যক্তি থেকে জাহান্নাম ১০০ বছরের পথ পরিমাণ দূরে সরে যাবে।''[6]

৭। আবু উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘‘যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি রোযা রাখবে, আল্লাহ সেই ব্যক্তি ও দোযখের মাঝে একটি এমন প্রতিরক্ষার খাদ তৈরী করে দেবেন; যা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী জায়গা সমপরিমাণ চওড়া।’’[7]

৮। উসমান বিন আবূল আস কর্তৃক বর্ণিত, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘‘রোযা হল দোযখ থেকে বাঁচার জন্য ঢালস্বরূপ; যেমন যুদ্ধের সময় নিজেকে রক্ষা করার জন্য তোমাদের ঢাল হয়ে থাকে।’’[8]

৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘‘রোযা হল জাহান্নাম থেকে রক্ষার জন্য ঢাল ও দুর্ভেদ্য দুর্গস্বরূপ।’’[9]

১০। আব্দুল্লাহ বিন আম্র (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘‘কিয়ামতের দিন রোযা এবং কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি ওকে পানাহার ও যৌনকর্ম থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।’ আর কুরআন বলবে, ‘আমি ওকে রাত্রে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।’ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘‘অতএব ওদের উভয়ের সুপারিশ গৃহীত হবে।’’[10]

১১। আবু উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন কোন আমলের আজ্ঞা করুন; যদদ্বারা আল্লাহ আমাকে লাভবান করবেন।’ (অন্য এক বর্ণনায় আছে, ‘যার মাধ্যমে আমি জান্নাত যেতে পারব।’) তিনি বললেন, তুমি রোযা রাখ, কারণ এর সমতুল কিছু নেই।’ পুনরায় আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে কোন আমলের আদেশ করুন।’ তিনিও পুনঃ ঐ কথাই বললেন, ‘‘তুমি রোযা রাখ, কারণ এর সমতুল কিছু নেই।’[11]

১২। হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমার বুকে হেলান দিয়ে ছিলেন। সেই সময় তিনি বললেন, ‘‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার পর যে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে একদিন রোযা রাখার পর যে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের আশায় কিছু সাদকাহ করার পর যে ব্যক্তির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে সেও জান্নাত প্রবেশ করবে।’’[12]

[1] (বুখারী ১৯০৪, মুসলিম ১১৫১ নং)

[2] (বুখারী ১৮৯৫, মুসলিম ১৪৪নং)

[3] (বুখারী১৮৯৬ নং, মুসলিম ১১৫২ নং, নাসাঈ, তিরমিযী)

[4] (বুখারী ১৮৯৭, মুসলিম ১০২৭নং)

[5] (বুখারী ২৮৪০ নং, মুসলিম ১১৫৩ নং , তিরমিযী, নাসাঈ)

[6] (নাসাঈ, সহীহুল জামেইস সাগীর, আলবানী ৬৩৩০নং উকবাহ হতে,ত্বাবারানী কাবীর ও আওসাত্ব, সহীহ তারগীবঃ৯৭৫ নং)

[7] (তিরমিযী, সহীহুল জামেইস সাগীর, আলবানী ৬৩৩৩নং)

[8] (আহমাদ, মুসনাদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামেইস সাগীর, আলবানী ৩৮৭৯নং)

[9] (আহমাদ, মুসনাদ, বাইহাকী শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামেইস সাগীর, আলবানী ৩৮৮০নং)

[10] (আহমাদ, মুসনাদ, ত্বাবারানী, মু'জাম কাবীর, হাকেম, মুস্তাদ্রাক, ইবনে আবিদ্দুনয়্যার 'কিতাবুল জু', সহীহ তারগীব, আলবানী ৯৬৯ নং)

[11] (নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ, হাকেম, মুস্তাদ্রাক, সহীহ তারগীব, আলবানী ৯৭৩ নং)

[12] (আহমাদ, মুসনাদ, সহীহ তারগীব, আলবানী ৯৭২ নং)

রোযার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, উপকারিতা ও যৌক্তিকতা

মহান আল্লাহর ৯৯ এর অধিক সুন্দর নামাবলীর অন্যতম নাম হল 'আল-হাকীম।' 'আল-হাকীম' অর্থ হিকমত-ওয়ালা, বিজ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়। আর হিকমত ও প্রজ্ঞা হল সর্বকর্ম যথাযোগ্যভাবে নৈপুণ্যের সাথে সম্পাদন করা। মহান আল্লাহর এই নামের দাবী এই যে, তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন অথবা মানুষের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তার প্রত্যেকটার পশ্চাতে আছে পরিপূর্ণ যুক্তি ও হিকমত; তা কেউ বুঝতে সক্ষম হোক অথবা অক্ষম।

যে রোযা আল্লাহ তাআলা বান্দার উপর ফরয ও বিধিবদ্ধ করেছেন তার মাঝে রয়েছে অভাবনীয় যৌক্তিকতা ও অচিন্তনীয় উপকারিতা। যেমনঃ-

১। রোযা হল এক এমন ইবাদত, যার মাধ্যমে বান্দা প্রভুর নৈকট্যলাভ করতে সক্ষম হয়। এতে সে প্রকৃতিগতভাবে যে জিনিস ভালোবাসে তা বর্জন করে; বর্জন করে সকল প্রকার পানাহার ও যৌনক্রিয়া। আর এর মাধ্যমে সে নিজ প্রতিপালকের সন্তুষ্টি কামনা করে। আশা

করে পরকালের সাফল্য ও বেহেশতলাভ। এতে এই কথাই স্পষ্ট হয় যে, সে নিজের প্রিয় বস্তুর উপর প্রভুর প্রিয় বস্তুকে প্রাধান্য দেয় এবং ইহকালের জীবনের উপর পরকালের জীবনকেই শ্রেষ্ঠত্ব দেয়।

২। রোযাদার যথানিয়মে রোযা পালন করলে রোযা তাকে মুত্তাকী ও পরহেযগার বানাতে সহায়ক হয়। তার জীবন পথে তাকওয়া ও পরহেযগারীর আলো বিচ্ছুরিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, ‘‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হল, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের উপর ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা পরহেযগার হতে পার।’’ (কুরআনুল কারীম ২/১৮৩)

সুতরাং রোযাদার রোযা রেখে তার জীবনের প্রত্যেক চিন্তা, কথা ও কর্মে ‘তাকওয়া’ আনবে - এটাই বাঞ্ছিত। আর ‘তাকওয়া’ হল সেই আল্লাহ-ভীতির নাম, যার মাধ্যমে বান্দা তাঁর সকল আদেশ যথাসাধ্য পালন করে চলবে এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কর্ম থেকে সুদূরে থাকবে। বলা বাহুল্য, এটাই হল রোযার মহান উদ্দেশ্য ও প্রধান লক্ষ্য। পানাহার ও যৌনক্রিয়া নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে মানুষকে বৃথা কষ্ট দেওয়া রোযার উদ্দেশ্য নয়। প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘‘যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা কথা ও তার উপর আমল ত্যাগ করতে পারল না, সে ব্যক্তির পানাহার ত্যাগ করার মাঝে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।’’[1]

৩। রোযা আত্মাকে তরবিয়ত দান করে, চরিত্রকে সভ্য ও আদর্শভিত্তিক করে গড়ে তোলে এবং রোযাদারের আচরণে উৎকৃষ্টতার স্থায়িত্ব আনয়ন করে। মুসলিমের সবভাব-প্রকৃতিতে রোযা গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। রোযার সংশোধনী বার্তা তার হৃদয়-মনে তাসীর রেখে যায়। রোযাদারের অন্তরে এমন জাগরণ সৃষ্টি করে এবং তার মনের দুয়ারে এমন অতন্দ্র প্রহরী খাড়া করে দেয় যে, সে নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয় এবং এই প্রহরীর চোখে ফাঁকি দিয়ে কোনও নৈতিকতা-বিরোধী কর্ম করতে ইচ্ছা ও চেষ্টাও করতে পারে না।

এটা কি করে হতে পারে যে, রোযাদার তার প্রতিপালকের নিকট সত্যবাদিতার পরিচয় দেবে, অথচ মানুষের সঙ্গে মিথ্যা বলবে? নিজের রোযায় আন্তরিকতা রাখবে, অথচ নিজ সমাজের সঙ্গে ধোকাবাজী ও কপটতা প্রদর্শন করবে? ইখলাস ও আন্তরিকতা একটি সামগ্রিক বস্তু; যা ভাগাভাগি হয় না। যার সর্বোচ্চ পর্যায় ও সারাংশ হল সৃষ্টিকর্তা অন্তর্যামী আল্লাহর সাথে আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধচিত্ততা। সুতরাং যে ব্যক্তির আল্লাহর সাথে আন্তরিকতা থাকবে, সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে অসম্ভব যে, সে মানুষকে ধোকা দেবে, আমানতে খেয়ানত করবে, অপরকে ঠকিয়ে খাবে, চুরি করবে, যুলম করবে অথবা অপরকে কষ্ট দেবে। পক্ষান্তরে যদি কারো চক্রান্তে পড়ে বা ভুলক্রমে এ ধরনের কোন পাপ করেই বসে, তাহলে সাথে সাথে সে সুপথে ফিরে আসে, আল্লাহর নিকট তওবা করে, অনুতপ্ত হয়, লজ্জিত হয় সীমাহীন।

সুতরাং রোযা হল একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুচরিত্র গঠনের উপকরণ এবং তা সমৃদ্ধকরণের জন্য আভ্যন্তরীণ এক মৌলিক উপাদান। আর বিদিত যে, বাহ্যিক সৌন্দর্যের বাহার কোন মূল্য রাখে না; যদি না অভ্যন্তর সুদৃঢ় ও মজবুত হয়। তাই রোযাদারের জীবনে তার আখলাক-চরিত্র

স্থায়িত্ব, স্থিতিশীলতা, বর্ধনশীলতা ও শ্রীবৃদ্ধিশীলতার গুণাবলী গ্রহণ করে থাকে। কারণ, তার সকল আচরণ ভিতর ও বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত হয়ে যায়।[2]

৪। রোযা রোযাদারের আচার-ব্যবহারকে সুন্দর করার কাজে বড় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। পূর্ণ একটি মাস ধরে তাকে পাপ থেকে দূরে রাখে, নিষিদ্ধ ও হারাম বস্তু থেকে নিরাপদে রাখে। বরং রোযা তাকে এক মহান ইবাদতে মশগুল রাখে, হীনতা ও নীচতা হতে রক্ষা করে, প্রত্যেক নোংরামীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। সুতরাং সে না চুগলী করে, না গীবত। না মিথ্যা বলে, না অশ্লীল। না ফিতনা সৃষ্টি করে, না ফাসাদ। না অসার বকে, না ফালতু। কোন প্রকারের পাপাচরণ তার দ্বারা সংঘটিত হয় না। ফলে প্রকৃত রোযাদার রোযার পরেও একটি নিষ্পাপ ও পবিত্র মানুষের মত যাবতীয় সচ্চরিত্রতার অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে সুখময় জীবন-যাপন করতে পারে।[3]

৫। রোযা মন ও প্রবৃত্তিকে দমন ও নিয়ন্ত্রণ করার অনুশীলন দেয়। জিতেন্দ্রিয় ও সংযমী হতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে রোযাদার তার মন ও প্রবৃত্তিকে সেই কাজে ব্যবহার করতে পারে; যাতে ইহ-পারলৌকিক সকল প্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত আছে। আর এমন আচরণ ও কর্ম থেকে তাকে দূরে রাখে; যাতে সে একটি ইন্দ্রিয়সেবী ও পাশবিক গুণসম্পন্ন মানুষ বলে পরিচিত হতে পারে; যেখানে সে কামনা-বাসনা ও লালসার প্রবণতা থেকে তাকে রুখতে সক্ষম হয় না। সুতরাং রোযা সেই মন্দপ্রবণ আত্মার বিরুদ্ধে লড়ায়ে বিজয়ী হতে মুসলিমকে সার্বিক সহযোগিতা করে, যে আত্মা সর্বদা হারাম কাজে লিপ্ত হতে চায়, অবৈধভাবে কাম-লালসা চরিতার্থ করতে চায়। রোযা রোযাদারের ইচ্ছাশক্তিকে সর্বপ্রকার পাপ ও কুপ্রবৃত্তির স্পর্শ থেকে দূরে থাকার 'ট্রেনিং' দেয়। রোযার মাঝে রয়েছে আত্মসংযম এবং কুপ্রবৃত্তির দমন।

আধুনিক যুগের মানুষ অধিকাংশে নিজ কামনা-বাসনার কাছে বড় দুর্বল, কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ-প্রবণ খেয়ালখুশীর বশীভূত। আর মনকে সবল ও সুদৃঢ় করতে রোযা ছাড়া আর অন্য কোন উপায়-উপকরণ নেই। কারণ, রোযাদার অত্যন্ত ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর থাকা সত্ত্বেও পানাহার বর্জন করে থাকে। আর নিঃসন্দেহে এ কাজে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা সৃষ্টি হয় এবং সর্বকাজে মনোবল প্রবল ও সুদৃঢ় হয়।

৬। রোযা রোযাদারকে কুঅভ্যাসের দাসত্ব থেকে মুক্তিদান করে। এমন বহু মানুষ আছে, যারা এমন বহু নোংরা অভ্যাসে অভ্যাসী হয়ে পড়ে এবং তার ফাঁদ থেকে বের হওয়ার কোন পথ খুঁজে পায় না। কিন্তু রোযা এলে তাদেরকে দেখা যায় যে, তারা তাদের সে সমস্ত কুঅভ্যাসকে পরিপূর্ণরূপে বর্জন করে ফেলেছে।

বলা বাহুল্য, এটাই হয় তাদের জন্য সুবর্ণ-সুযোগ; যার মাঝে তাদের সেই সকল মন্দ অভ্যাসের পঞ্জা থেকে নিজেদেরকে সহজ উপায়ে স্বাধীন করে নিতে পারে, যে সকল অভ্যাস তাদের মানসিক দুশ্চিন্তা ও ব্যাধির একমাত্র কারণ।[4]

অতএব সেই সকল রোযাদারগণ যারা ধুমপানে অভ্যাসী; যাদের অবৈধ বিড়ি-সিগারেট বিনা ৩০ মিনিটও অতিবাহত হয় না, অথবা তা পান না পর্যন্ত পায়খানাও হয় না, যাদের দৈনিক ১

প্যাকেট সিগারেট পানে তাদের ৫০ বছর জীবনে প্রায় ১ লাখ ৮২ হাজার ৫০০ টাকা এবং ১৫২০৮ ঘ¦টা ২০ মিনিট সময় অপচয় হয়, তাদের উচিৎ, রোযার এই পবিত্র অবসরে এই শ্রেণীর ‘বিষপান’ চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করা। কারণ, এ ‘সুখটান’ এমন ‘অগ্নিবাণ’ যে, তা মানুষের সুসবাস্থ্য, দেহ, অর্থ, দ্বীন, দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য বড় ক্ষতিকর। যে মানুষ ১২/১৩ ঘ¦টা আল্লাহর ওয়াস্তে তা বর্জন করে থাকতে পারে, সে মানুষ আল্লাহরই ভয়ে বাকী সময় পান না করলেও থাকতে পারবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে কোন জিনিস বর্জন করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহর ইচ্ছায় তার চাইতে উত্তম জিনিস অর্জন করবে। এটাই হল আল্লাহর রীতি। পরন্তু এ কোনক্রমেই উচিৎ নয় যে, রোযাদার সারাদিন হালাল জিনিস না খেয়ে রোযা রেখে পরিশেষে হারাম জিনিস দিয়ে রোযা খুলবে![5]

৭। রোযার মাঝে রয়েছে আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় ঈমান রাখার সবিশেষ প্রশিক্ষণ। কারণ, রোযা হল গুপ্ত ইবাদত। যেহেতু মানুষ এ ইবাদতে মুনাফেকী রাখতে পারে না। ইচ্ছা করলে সে গোপনে খেতে বা পান করতে পারে, অথবা উপবাস থেকেও নিয়ত ভেঙ্গে ফেলতে পারে। সুতরাং নিছক আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় ঈমান ও সত্য ভয় না থাকলে প্রকৃতরূপে রোযা রাখা যায় না।

বলা বাহুল্য, রোযা হল এমন একটি আন্তরিক ইবাদত, যা বান্দা ও প্রভুর মাঝে একান্ত গুপ্ত। অতএব গোপনে পানাহার করার সামর্থ্য ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা না করা এই কথাই প্রমাণ করে যে, সে বান্দা নিঃসন্দেহে এই বলে অটল বিশ্বাস রাখে যে, মহান আল্লাহ তার গোপন সব কিছুই দেখেন ও জানেন। আর এখান থেকেই রোযাদারের মনে ইবাদতে সততা ও আমানতদারী সৃষ্টি হয়। তাইতো আল্লাহ তাআলা রোযাকে পৃথক বৈশিষ্ট্য দান করেছেন; বান্দার প্রত্যেক আমলের সওয়াবকে ১০ গুণ থেকে ৭০০ গুণ; বরং আরো অনেক অনেক গুণ বর্ধিত করে থাকেন। কিন্তু রোযা নয়। রোযাকে তিনি নিজের জন্য খাস করে নিয়েছেন। আর তার সওয়াবের পরিমাণ যে কত, তা তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘‘আল্লাহ তাআলা বলেন, আদম সন্তানের প্রত্যেক আমল তার নিজের জন্য; তাতে তার সওয়াব ১০ থেকে ৭০০ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু রোযা নয়। রোযা হল আমার জন্য। আর আমি নিজে তার প্রতিদান দেব।’’[6]

৮। রোযা রোযাদারের মনে পরকালের প্রতি আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করে। কারণ, সে আল্লাহর নিকট আখেরাতে যে সওয়াব ও প্রতিদান আছে তা পাওয়ার আশায় আগ্রহান্বিত হয়ে পার্থিব কিছু সুখ-উপভোগ থেকে বিরত থাকে। সে যে নিক্তিতে লাভ-নোকসান ওজন করে থাকে তা হল পারলৌকিক। রোযার দিনে পানাহার ও যৌনসুখ শুধু এই আশায় পরিহার করে যে, এতে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার সাথে সাথে কিয়ামতের দিন উত্তম প্রতিদান পাবে। সুতরাং এইভাবে রোযা রোযাদারের মনে পরকালের প্রতি ঈমান বদ্ধমূল করে, পরলোকের সাথে অন্তরকে জুড়ে রাখে এবং ক্ষণস্থায়ী এই ধরাধামের পার্থিব ভোগ-বিলাসে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে;

যে ভোগ-বিলাস অনেক সময় মানুষকে আখেরাতের কথা বিস্মৃত করে এই ধারণা দেয় যে, সে পৃথিবীতে অমর ও চিরকাল থাকবে।[7]

৯। রোযা পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ এবং তাঁর পূর্ণ দাসত্ব করার কথা শিক্ষা দেয়। রোযা মুসলিমকে প্রকৃত দাসত্বের অনুশীলন দেয়। তাই তো সে রাতের বেলায় খায়, পান করে। কারণ, তার প্রভু যে বলেছেন,

(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)

অর্থাৎ, আর তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না (রাতের) কালো অন্ধকার থেকে ফজরের সাদা রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৭)

বলা বাহুল্য, এ জন্যই ইফতার ও সেহরীর সময় খাওয়া হল সুন্নত ও মুস্তাহাব এবং না খেয়ে একটানা পরপর কয়েকদিন রোযা রাখা মকরূহ। অতএব রোযা রাখার জন্য সেহরী খাওয়া এবং রোযার শেষে ইফতারী খাওয়া হল এক প্রকার আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর নির্দেশের আনুগত্য।

তদনুরূপ ফজর উদয় হলে মুসলিম পানাহার সহ সেই সকল বস্তু ও বিষয় থেকে দূরে থাকে, যাতে রোযা নষ্ট করে ফেলে। আর এর মাঝেও সে একমাত্র আল্লাহরই দাত্ব ও আনুগত্য করে। কারণ, তিনি বলেন,

(ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)

অর্থাৎ, অতঃপর তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৭)

সুতরাং এইভাবে মুসলিম মহান আল্লাহর পূর্ণ দাসত্ব ও আনুগত্যের উপর দীর্ঘ প্রশিক্ষণ লাভ করে থাকে।[8]

১০। রোযা মুসলিমের জন্য আল্লাহর এক প্রকার রহমত, করুণা ও অনুগ্রহ। মহান আল্লাহ মুসলিম জাতির প্রতি অনুগ্রহ ও করুণা প্রদর্শন করেই রোযা ফরয করেছেন। কারণ, এরই মাধ্যমে তিনি মুসলিমের পাপরাশি মার্জনা করে থাকেন, তার মর্যাদা উন্নীত করে থাকেন এবং বহুগুণ হারে তার সওয়াব বৃদ্ধি করে থাকেন।[9]

১১। রোযা হল গোনাহের কাফ্ফারা। কারণ, নেকীর কাজ গোনাহর কাজের গোনাহ নাশ করে দেয়। আর রোযা হল বড় নেকীর কাজ। মহান আল্লাহ বলেন,

(إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ)

অর্থাৎ, নিশ্চয় পুণ্যরাশি (সওয়াবের কাজ) পাপরাশিকে দূরীভূত করে। (কুরআনুল কারীম ১১/১১৪)

আর প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, "মানুষের পরিবার, ধন-সম্পদ ও প্রতিবেশী সংক্রান্ত পাপরাশিকে নামায, রোযা এবং সদকাহ মোচন করে দেয়।"[10] অর্থাৎ, মুসলিম যে গোনাহ তার পরিবারকে অন্যায়ভাবে উচ্চবাচ্য করে, কষ্ট দিয়ে অথবা কোন বিষয়ে তাদের প্রতি ত্রুটি ও অবহেলা প্রদর্শন করে, অথবা প্রতিবেশীকে কোন কথায় বা কাজে কোন

প্রকার কষ্ট দিয়ে, অথবা আর্থিক কোন প্রকার ত্রুটি ঘটিয়ে অথবা অনুরূপ অন্যান্য সাগীরা (ছোট) গোনাহ করে থাকে, সে সবকে তার নামায, রোযা এবং দান-খয়রাত মোচন করে দেয়। পরন্তু প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের আশা রেখে রমাযানের রোযা রাখে, তার পূর্বেকার সকল গোনাহ মাফ হয়ে যায়।"[11]

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, "কাবীরাহ গোনাহ না করলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমআহ থেকে অপর জুমআহ এবং এক রমাযান থেকে অন্য রমাযান -এর মধ্যবর্তীকালে সংঘটিত পাপসমূহের কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত)।" [12]

তদনুরূপ রোযা হল কসম ভাঙ্গার কাফ্ফারা (জরিমানা)। (কুরআনুল কারীম ৫/৮৯) যিহারের কাফ্ফারা। (কুরআনুল কারীম ৫৮/৪) কোন মুসলিমকে বা চুক্তিবদ্ধ কোন যিম্মীকে ভুলবশতঃ হত্যা করে ফেলার কাফ্ফারা। (কুরআনুল কারীম ৪/৯২) ইহরামে নিষিদ্ধ কর্ম করে ফেলার কাফ্ফারা। (কুরআনুল কারীম ২/১৯৬, ৫/৫) তামাত্তু' হজ্জের কুরবানী দিতে না পারলে তার কাফ্ফারা। (কুরআনুল কারীম ২/১৯৬) ইত্যাদি।

১২। রোযা রোযাদারের মনে ধৈর্য ও সহনশীলতা সৃষ্টি করে। কষ্টে ধৈর্য ধারণ ও সহনশীলতা অবলম্বন করতে অভ্যাসী বানায়। রোযা তাকে তার প্রিয় বস্তু ব্যবহার বর্জন করতে ধৈর্যের শিক্ষা দেয়। যেমন শিক্ষা দেয় কাম-দমন ও মনের যথেচ্ছাচার দমন করার; যা নিশ্চয় সহজ কাজ নয়।

বলা বাহুল্য, রোযা পালনে রয়েছে ৩ প্রকার ধৈর্য। মহান আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্য, তাঁর হারামকৃত বস্তু পরিহার করার উপর ধৈর্য এবং তাঁর নির্ধারিত তকদীরের বালা-মসীবতের উপর ধৈর্য। এই ৩ প্রকার ধৈর্য যে বান্দার মাঝে একত্রিত হবে, সেই হবে ইহকালে পরম সুখী এবং পরকালে আল্লাহর ইচ্ছায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

(إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ)

অর্থাৎ, ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার ও সওয়াব দান করা হবে। (কুরআনুল কারীম ৩৯/১০)

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ক্ষুৎ-পিপাসা ও যৌনক্ষুধায় ধৈর্যধারণ করাই হল ধৈর্যের শেষ পর্যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি এই শ্রেণীর ধৈর্য ধারণ করতে পারঙ্গম হবে, সে ব্যক্তির জন্য অন্য শ্রেণীর ধৈর্য ধারণ করা সহজ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ করবে, সে ব্যক্তি লাভ করবে শুভপরিণাম।

মহান আল্লাহ বলেন,

(وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ- جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا)

"যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টিলাভের জন্য ধৈর্যকষ্ট বরণ করে, যথাযথভাবে নামায পড়ে, আমি যে রুযী তাদেরকে দান করেছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করে এবং যারা ভালো

দ্বারা মন্দকে দূর করে- তাদেরই জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম; (আদ্ন) স্থায়ী বেহেশত, ওতে ওরা প্রবেশ করবে---।'' (কুরআনুল কারীম ১৩/২২-২৩)

১৩। রোযা হল ঢালস্বরূপ; দোযখ থেকে রক্ষার ঢালস্বরূপ।[13] একটি মাত্র রোযা জাহান্নামকে রোযাদার থেকে ৭০ বছরের পথ দূরে সরিয়ে দেয়।[14] সুতরাং যে ব্যক্তি পূর্ণ রমাযান মাসের রোযা রাখে এবং প্রত্যেক মাসে ৩টি রোযা অথবা আরো অন্যান্য নফল রোযা রাখে, সে ব্যক্তি থেকে দোযখ কত বছরের পথ দূরে সরে যায় তা অনুমেয়।

১৪। রোযা হল চরিত্রহীনতা ও ব্যভিচার ইত্যাদি অশ্লীলতা থেকে ঢালস্বরূপ। রোযা রোযাদারকে অবৈধ যৌনাচার থেকে হিফাযতে রাখে, যেমন ঢাল মুজাহিদ (যোদ্ধা)কে শত্রুপক্ষের তীর ও তরবারির আঘাত থেকে রক্ষা করে থাকে।

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ''হে যুবকদল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (বিবাহের অর্থাৎ স্ত্রীর ভরণপোষণ ও রতিক্রিয়ার) সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কারণ, বিবাহ চক্ষুকে দস্তুরমত সংযত করে এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করে। আর যে ব্যক্তি ঐ সামর্থ্য রাখে না, সে যেন রোযা রাখে। কারণ, তা যৌনক্ষুধা উপশমকারী।''[15]

বলা বাহুল্য, যে যুবক বিবাহের খরচাদি বহন করতে সক্ষম নয়, সে যুবককে মহানবী এই নির্দেশ দিলেন যে, সে যেন তার কামক্ষুধা ও যৌন-উত্তেজনা প্রশমিত করতে রোযার সাহায্য নেয়। কারণ, রোযা উক্ত ক্ষুধা ও উত্তেজনা দমন ও নিবারণ করে। আর অনেকের অভিজ্ঞতা দ্বারা উক্ত নববী চিকিৎসা প্রমাণিত ও পরীক্ষিত যে, কামপীড়িত যুবকের জন্য যে কোনও সেব্য ঔষধ অপেক্ষা রোযাই হল উত্তম ও অব্যর্থ ঔষধ।

১৫। রোযা হল বেহেশ্তেগামী পথ। আবূ উমামাহ (রাঃ) জান্নাতে প্রবেশ করাবে এমন আমল প্রসঙ্গে যখন আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট নির্দেশ চাইলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, ''তুমি রোযা রাখ। কারণ, তার মত অন্য কোন আমল নেই।''[16] তাছাড়া মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) রোযাদারকে বেহেশ্তে 'রাইয়ান' নামক এক বিশেষ দরজা দিয়ে প্রবেশ করার সুসংবাদ দিয়েছেন।[17] আর 'রাইয়ান' (তৃষ্ণাহীন) দ্বার আমল অনুযায়ী রোযাদারের জন্য বড় উপযুক্ত। কারণ, রোযা রাখার ফলে দুনিয়াতে সে পিপাসায় কাতর হয়। তাই তারই বিনিময়ে পরকালে ''সেই দ্বারে যে প্রবেশ করবে সে (বেহেশ্তী পানীয়) পান করবে। আর যে ব্যক্তি একবার তা পান করবে, সে ব্যক্তি আর কোন কালেও পিপাসিত হবে না।''[18]

১৬। রোযা পালনের মাধ্যমে রোযাদার তার মহান প্রভুর সন্তুষ্টি লাভ করে থাকে। যার জন্য তার উপবাস-জনিত মুখের দুর্গন্ধও আল্লাহর নিকট কস্তুরী অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধময় হয়![19] অথচ খালি পেটে থাকা অবস্থায় মুখ থেকে বের হওয়া ঐ দুর্গন্ধ কোন মানুষ পছন্দ করে না; বরং ঘৃণাই করে থাকে। কিন্তু তা মহান স্রষ্টার নিকটে অতি পছন্দনীয়। কারণ, এ গন্ধ তাঁরই আনুগত্য ও সন্তুষ্টির পথে নির্গত হয়ে থাকে।

১৭। রোযাদার ব্যক্তির দুআ রোযা রাখা অবস্থায় কবুল হয়ে থাকে। প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘‘তিন প্রকার দুআ আল্লাহর নিকট কবুল হয়ে থাকে; রোযাদারের দুআ, অত্যাচারিতের দুআ এবং মুসাফিরের দুআ।’’[20]

১৮। রোযা কিয়ামতের ভীষণ বিচার দিনে রোযাদারের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে; বলবে, ‘হে আমার প্রভু! আমি ওকে দিনের বেলায় পানাহার ও যৌনক্রিয়া থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ গ্রহণ করে নাও।’ অতঃপর মহান প্রভু তার সে সুপারিশ গ্রহণ করে নেবেন।[21]

১৯। রোযা রোযাদারের জন্য ইহ-পরকালের খুশী ও সুখের হেতু। যেমন মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘‘রোযাদারের জন্য রয়েছে ২টি খুশী; প্রথম খুশী হল ইফতার করার সময় এবং দ্বিতীয় খুশী হল প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়।’’[22]

রোযাদারের ইফতার করার সময় যে খুশী, তা হল সেই সুখ ও তৃপ্তির একটি নমুনামাত্র; যা মুমিন ব্যক্তি নিজ প্রভুর আনুগত্য ও তাকওয়ার মাধ্যমে অর্জন করে থাকে। আর প্রকৃতপ্রস্তাবে এটাই হল আসল সুখ। এই সুখ ও তৃপ্তি দুইভাবে অনুভূত হয়ে থাকেঃ-

(ক) আল্লাহ তাআলা ঐ ইফতারের সময় রোযাদারের জন্য পানাহার বৈধ করে দিয়েছেন। আর নিঃসন্দেহে মানুষের প্রকৃতি এই যে, (বিশেষ করে খিদে থাকা অবস্থায়) খাবার দেখলে মন আনন্দে নেচে ওঠে। আর এ জন্যই তা বর্জন করা হল আল্লাহর ইবাদত।

(খ) সে মুহূর্তে রোযাদার তার একটি রোযা সম্পন্ন করে থাকে। সুতরাং আল্লাহর তওফীক অনুযায়ী সে সেদিনকার রোযা ও ইবাদত যে পালন ও পূর্ণ করতে পারল, তারই খুশী তার মনকে আন্দোলিত করে তোলে।[23]

পক্ষান্তরে সবচেয়ে বড় খুশী যা, তা রয়েছে পরকালে; যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হবে যাঁর জন্য রোযাদার রোযা রেখে থাকে।

২০। রোযা হল পরহেযগার ও নেক লোকদের ট্রেনিং-ময়দান; যার মাঝে আল্লাহর দেওয়া পৃথিবীর খেলাফতের দায়িত্ব পালন করার উপর নিজেদের কর্তব্যের বিভিন্ন ট্রেনিং নিয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, রোযা দেহ-মনের জন্য একটি বড় রহমত। রোযার মাঝেই হৃদয় ও সকল চিন্তা-ভাবনা আল্লাহ তাআলার সাথে যুক্ত থাকে। সকল মনোবল তাঁর ভালোবাসা, আনুগত্য ও তাঁর পথে জিহাদের কাজে বর্ধিত ও সংবদ্ধ হয়ে থাকে। যার পশ্চাতে উদ্দেশ্য থাকে এই যে, আল্লাহর বাণীই সমুন্নত হোক এবং কাফেরদের বাণী হোক অবনত; সে কাফের যেমনই হোক, তার যে নাম বা উপাধি হোক অথবা যে প্রতীকই হোক।[24]

২১। রোযা হল কচি-কাঁচা শিশুর মনের মাটিতে ‘আমানতদারী’র বীজ রোপণ করার এক বাস্তবভিত্তিক ইতিবাচক ও কার্যকর প্রক্রিয়া। শিশু-কিশোরকে রোযা রাখতে অভ্যাসী করার সময় যখন তাকে পানাহার করতে নিষেধ করা হয় এবং খাবার ও পানি হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও সে শুধু এই বিশ্বাসে তা খেতে পারে না যে, এ নিষেধ হল আল্লাহর এবং তিনি তাকে দেখছেন। অথচ এ ব্যাপারে কেবল তার মন ও বিবেক ছাড়া অন্য কেউ পর্যবেক্ষক নেই।

সুতরাং কাঁচা মনে আমানতদারী বদ্ধমূল করতে এই অনুভূতি অপেক্ষা অধিক প্রতিক্রিয়াশীল আর অন্য কি হতে পারে?

যার ফলে শৈশব থেকেই শিশু আমানতদারীর মত এক নৈতিকতাপূর্ণ কর্মে অভ্যাসী হয়ে গড়ে ওঠে এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পরেও তার যথার্থ হিফাযত করতে ও তার মনে তা আজীবন বহাল রাখতে কোন প্রকার কষ্টবোধ করে না।[25]

২২। রোযা মানুষের হৃদয়কে নরম করে, আল্লাহ-প্রেমী করে এবং সর্বদা তাঁর যিক্র ও শুক্র করতে অভ্যাসী করে।

২৩। রোযা মানুষের মাঝে শয়তানের প্রবেশ ও প্রবাহ-পথ রুদ্ধ করে। এর ফলে তার দেহ-মনে শয়তানের আধিপত্য কমে যায়। পক্ষান্তরে যখনই মানুষ নিজ প্রবৃত্তির লাগাম ছেড়ে দেয়, তখনই শয়তান তা লুফে নিয়ে তাকে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে পরিচালিত করতে থাকে।[26]

২৪। রোযা হল আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করার অন্যতম মাধ্যম। কারণ, রোযা হল পানাহার ও যৌনমিলন থেকে বিরত থাকার নাম। আর মানুষের উপর আল্লাহর যে সকল বড় বড় নেয়ামত রয়েছে তার মধ্যে পানাহার ও যৌনমিলন হল অন্যতম। সুতরাং মানুষ এ নেয়ামতের কদর তখনই বুঝবে, যখন সে এ নেয়ামত থেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বঞ্চিত থাকবে। কারণ, হারিয়ে না গেলে কোন নেয়ামতের কদর বুঝা যায় না। আর যখনই উক্ত নেয়ামতের কদর সে বুঝবে, তখনই তার অবশিষ্ট অধিকার আদায়ের জন্য শুক্রিয়া জ্ঞাপন করবে। পক্ষান্তরে নেয়ামতের শুক্র আদায় করা ফরয; শরীয়তে এবং বিবেক মতেও। রোযার আয়াতে মহান আল্লাহ ঐ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেই বলেন,

(ولعلَّكُمْ تَشْكُرُوْن)

অর্থাৎ, যাতে তোমরা শুক্র আদায় কর। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৫)

রোযাদার যখন ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করে, তখন সে সেই গরীব-নিঃসবদের কষ্টের কথাও উপলব্ধি করে; যারা ক্ষুধার সময় পেটে এক মুঠো অন্নও যোগাড় করতে সমর্থ নয়। এর ফলে ঐ উপলব্ধি তাকে তাদের জন্য দান-খয়রাত করে সহানুভূতি প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ, নিজের দেখা বিষয় শোনা বিষয়ের মত নয়। নিজের দেখা ও পরীক্ষা করা বিষয়ে অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতীতি জন্মে অধিক। যেমন একজন ঘোড়সওয়ার লোক পথ চলার কষ্ট ততক্ষণ অনুভব করতে সক্ষম নয়; যতক্ষণ না সে নিজে পায়ে হেঁটে পথ চলে দেখেছে।[27]

২৫। রোযার মাধ্যমে রোযাদার ক্ষুধা-জনিত দুর্বলতার ফলে সে আল্লাহর কতটা মুখাপেক্ষী তা আন্দাজ করতে পারে। আর যে ব্যক্তি নিজের মাঝে নিজের দুর্বলতা চিনতে পারে, সে ব্যক্তির মিথ্যা অহংকার দূরীভূত হয়ে যায়। পরন্তু আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করেন, যে নিজের কদর নিজে জেনেছে।[28]

২৬। রোযাতে রোযাদার ফিরিশ্তামন্ডলীর অনুরূপ কর্মে শামিল হতে পারে; যে ফিরিশ্তামন্ডলী আল্লাহর কোন প্রকার অবাধ্যাচরণ করেন না। তাঁরা তাই করেন, যা করতে তাঁদের প্রতিপালক

তাঁদেরকে আদেশ করেন। দিবারাত্র তাসবীহ পাঠ করতে থাকেন এবং কোন প্রকার ক্লান্তিবোধ করেন না। যাঁরা খান না এবং পানও করেন না।[29]

২৭। রোযা রোযাদারের ঈমান বৃদ্ধি করে। এই রোযাতে মানুষ অধিকাধিক নামায পড়ে, কুরআন তেলাঅত ও যিক্র করে, দান-খয়রাত করে, দুআ ও ইস্তিগফার তথা তওবা করে, ওয়ায-নসীহত শোনে। রোযা তাকে মন্দ কাজ করতে বাধা দেয়। বলা বাহুল্য, এ সবে পাপ বন্ধ থাকে এবং ঈমান বর্ধিত হয়।[30]

২৮। রোযার মাসে রোযাদারের দ্বীনী জ্ঞান বর্ধিত হয়ে থাকে। কারণ, রমাযান হল ইবাদতের মাস, আল্লাহর আয়াত নিয়ে ভাবনা-চিন্তা ও গবেষণা করার মাস। কুরআন মাজীদ তেলাঅত করা ও শোনার মাস।[31]

২৯। এ মাসে দ্বীনের আহবায়কদের জন্য রয়েছে সুবর্ণ সুযোগ। এ মাসে অধিকাংশ মুসলিম জনসাধারণ মসজিদের দিকে ধাবিত হয়। এদের মধ্যে কেউ বা তার জীবনে প্রথমবার প্রবেশ করে, কেউ বা অনেক দিন হল মসজিদ ত্যাগ করেছিল। এ সময় তাদের হৃদয় এক প্রকার দুর্লভ নম্রতা ও তরঙ্গায়িত ভক্তিতে গদ্গদ্ করে।

সুতরাং এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মন-গলানো উপদেশমালা এবং উপযুক্ত ওয়ায ও দর্স প্রয়োগ করে তাদের ঈমান বাড়াতে সাহায্য করা উচিৎ। আর এ কাজে অবশ্যই সৎ ও আল্লাহভীতির কাজে সহায়তা হয়ে থাকে।[32]

পরন্তু রমাযানের রোযা বছরান্তে একবার ফরযরূপে এসে থাকে। যা হজ্জের মত জীবনে একবার নয়। যাতে প্রত্যেক বছর ঈমানী দর্সের পুনরাবৃত্তি হয় এবং রোপিত ঈমানী বৃক্ষ সহসায় বেড়ে ওঠে।

৩০। রোযার মাধ্যমে মুসলিমদের সামাজিক উপকারিতা সাধন হয়ে থাকে। রোযা হল মুসলিম জাতির ঐক্যের নিদর্শন, সারা উম্মাহর মাঝে সংহতির প্রতীক, গরীব-ধনীর মাঝে সাম্য ও সম্প্রীতির চিহÁ। এতে আম-খাস, আতরাফ-আশরাফ, আমীর-ফকীরের ভেদাভেদ চূর্ণ হয়ে যায়। সকলের মনে একটাই বোধ জাগে যে, মুসলিম জাতি হল এক জাতি। সকলে একই সময়ে পানাহার করে, একই সময়ে রোযা রাখে। একই জামাআতে মসজিদে তারাবীহর নামায পড়ে। যেন সকলের হৃদয় এক, মাস এক, কর্মও এক, যাদেরকে তাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তারা হল একটি দেহের মত।

৩১। রোযার উপবাস সবাস্থ্যের জন্য বড় উপকারী। রোযাতে তুলনামূলকভাবে কম খাওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট সময় ধরে পাকস্থলীকে বিরতি দেওয়া হয়। এর ফলে শরীরের মেদ, ক্লেদ ও আর্দ্রতা ইত্যাদি দূরীভূত হয়ে যায়।[33] আর একথা বিদিত ও স্বীকৃত যে, শরীরের মধ্যে পেট হল রোগের বাসা এবং ব্যবস্থাপিত ও নিয়ন্ত্রিত খাদ্য আহার করা হল শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা। বলা বাহুল্য, এ কথা বহু চিকিৎসকই স্বীকার করেছেন যে, রোযাতে রয়েছে বহু দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি থেকে নিরাপত্তা, বিশেষ করে যক্ষ্মা, ক্যানসার ইত্যাদি।

রোযায় রয়েছে শরীরের ওজন বৃদ্ধি, হ্যাপাটাইটিস, জন্ডিস, প্লীহা, যকৃৎ, বদহজম, প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা।

রোযা ফরয হয়েছে সুস্থ মানুষের উপর। যাতে আক্রমণের পূর্বেই ঐ সকল বা আরো অজানা বহু রোগের হাত থেকে বাঁচার উপায় পাওয়া যায়। তাছাড়া বহু গবেষণা এ কথা প্রমাণ করেছে যে, পানাহার থেকে বিরত থাকা একটি প্রকৃতিগত ব্যাপার; যা মহান সৃষ্টিকর্তা নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময় ব্যাপী জীবজগতের জন্য অনিবার্য করেছেন। আর তা শুধু এই জন্য যে, যাতে করে প্রাণীজগৎ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়, বাঁচার জন্য শক্তি পায় এবং নিজ নিজ বংশবিস্তারে যথানিয়মে সক্রিয় থাকতে পারে।

জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গের উপবাস করার কথা অনেকের অজানা নয়। কোন কোন জন্তু লম্বা সময় ধরে প্রায় কয়েক মাস যাবৎ উপবাস করে। কোন কোন জন্তু কয়েক দিন ধরে উপবাস করে। বরং উদ্ভিদজগৎও উপবাস পালন করে থাকে। যার ফলে নতুন, সুন্দর ও লকলকে পাতা বের হয়ে আসে এবং শান্ত শীতে নিদ্রার পর ফুল-ফলে সুশোভিত হয়ে শক্তিশালী ও সজীবরূপে শুরু হয় বৃক্ষ-তরুলতার আনন্দময় বসন্তকাল।

ডাঃ সলোমন মানব-দেহকে ইঞ্জিনের সাথে তুলনা করে বলেন, 'ইঞ্জিন রক্ষাকল্পে মধ্যে মধ্যে ডকে নিয়া চুল্লি হইতে ছাই ও অঙ্গার সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত করা যেমনটা আবশ্যক - উপবাস দ্বারা মধ্যে মধ্যে পাকস্থলী হইতে অজীর্ণ খাদ্যটি নিষ্কাশিত করাও তেমনটা দরকার।'[34]

৩২। রোযা মানুষের চিন্তাশক্তির প্রখরতা বৃদ্ধি করে। কারণ, পেট খালি থাকলে চিন্তা-গবেষণা নির্মল হয় এবং মন-মগজের কর্ম সুন্দর হয়।

পক্ষান্তরে যারা ধারণা করে যে, রোযা মানুষের খরচ বাড়ায় এবং অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয় এই রোযার মাসে, তাদের ধারণা সঠিক নয়। কেননা, খাবারের নানান ভ্যারাইটিজ তৈরী করা এবং প্রয়োজনের তুলনায় বেশী খাবার প্রস্তুত করা, রমাযানের জন্য বিশেষ বিশেষ ধরন ও বরনের খাদ্যপণ্যের বিপণন ঘটানোতে ইসলামের অনুমোদন নেই। বরং তা হল অপচয়। আর অপচয় ইসলামে নিষিদ্ধ; রমাযানে এবং অন্য মাসেও।

বলাই বাহুল্য যে, রোযাতে রয়েছে মঙ্গলই মঙ্গল। ব্যক্তি ও সমাজের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে সেই মঙ্গল অনস্বীকার্য। আর মহান আল্লাহর এই বাণীর মধ্যে সেই মঙ্গলের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি বলেন,

(وَأَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ)

অর্থাৎ, তোমাদের রোযা রাখাটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর; যদি তোমরা উপলব্ধি কর। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৪)

[1] (বুখারী ৬০৫৭, ইবনে মাজাহ ১৬৮৯, আহমাদ, মুসনাদ ২/৪৫২, ৫০৫, ফুসূলুন ফিস্-সিয়ামি অত্-তারাবীহি অয্-যাকাহ ৬-৭পৃঃ)

[2] (ফাইযঃ ২২৪পৃঃ)

[3] (সাওমু রামাযান ৪০পৃঃ)

[4] (সাওমু রামাযান ৪০পৃঃ)

[5] (ইতহাফ ৪২পৃঃ)

[6] (আহমাদ, মুসনাদ ২/৫০৩)

[7] (দুরুসু রামাযান অকাফাত লিস্-সায়েমীন ১০পৃঃ)

[8] (দুরুসু রামাযান অকাফাত লিস্-সায়েমীন ১০পৃঃ)

[9] (ইতহাফ ৪১পৃঃ)

[10] (বুখারী ১৭৯৬, মুসলিম ১৪৪নং)

[11] (বুখারী ৩৮, মুসলিম ৭৬০নং)

[12] (আহমাদ, মুসনাদ, মুসলিম ২৩৩নং, তিরমিযী)

[13] (ত্বাবারানী, মু'জাম, সহীহুল জামেইস সাগীর, আলবানী ৩৮৬৭নং)

[14] (বুখারী ২৬৮৫, মুসলিম ১১৫৩নং)

[15] (বুখারী ৪৭৭৯, মুসলিম ১৪০০, মিশকাতুল মাসাবীহ ৩০৮০নং)

[16] (নাসাঈ ২২২১নং)

[17] (বুখারী ১৭৯৭, মুসলিম ১১৫২নং)

[18] (আহমাদ, মুসনাদ, নাসাঈ, সহীহুল জামেইস সাগীর, আলবানী ৫১৮৪নং)

[19] (বুখারী ১৮০৫, মুসলিম ১১৫১নং)

[20] (বাইহাকী শুআবুল ঈমান, ইবনে আসাকের, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ১৭৯৭নং)

[21] (আহমাদ, মুসনাদ ২/১৭৪, হাকেম, মুস্তাদ্রাক ১/৫৫৪)

[22] (বুখারী ১০৮৫, মুসলিম ১১৫১নং)

[23] (দুরুসু রামাযান অকাফাত লিস্-সায়েমীন ১৭পৃঃ)

[24] (ফাইযঃ ১০৭পৃঃ)

[25] (সাওমু রামাযান ৩৯পৃঃ)

[26] (ফাইযঃ ১০৮পৃঃ)

[27] (ফাইযঃ ১৪পৃঃ, সাবঊনা মাসআলাহ ফিস্-সিয়াম ৪নং)

[28] (ইতহাফ ৪৫পৃঃ)

[29] (ঐ ৪৫পৃঃ)

[30] (ঐ ৪৫পৃঃ)

[31] (সাওমু রামাযান ৪১পৃঃ)

[32] (সাওমু রামাযান ৪১পৃঃ)

[33] (ফসূলঃ ৮পৃঃ)

[34] (বাংলা মিশকাত ৪/২৬৩)

রোযার প্রকারভেদ

রোযা হল দুই প্রকার; ফরয (বাধ্যতামূলক) ও নফল (অতিরিক্ত)। ফরয রোযা আবার ৩ প্রকার; রমাযানের রোযা, কাফ্ফারার রোযা এবং নযর মানা রোযা।

এক্ষণে রমাযানের রোযা সংক্রান্ত বিভিন্ন মাসায়েল আলোচনা করব।

রমাযানের রোযার মান

রমাযানের রোযা আল্লাহর কিতাব, তাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস ও মুসলিম উম্মাহর ইজমা' (সর্বসম্মতি) মতে চিরকালের জন্য ফরয।

কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ- أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ﴾

''হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হল, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের উপর ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা পরহেযগার হতে পার। তা নির্ধারিত কয়েক দিন-- ।''(কুরআনুল কারীম ২/১৮৩-১৮৪)

তিনি আরো বলেন,

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

''রমাযান মাস; যে মাসে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে রোযা রাখে।' (কুরআনুল কারীম ২/১৮৫)

হাদীসে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ''ইসলামের ভিত্তি হল ৫টি কর্ম; আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্যিকারে উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাঁর রসূল (দূত) -এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া, নামায কায়েম করা, যাকাৎ প্রদান করা, রমাযানের রোযা রাখা এবং সামর্থ্য থাকলে কা'বাগৃহের হজ্জ করা।''[1]

তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার উপর আল্লাহ কি কি রোযা ফরয করেছেন তা আমাকে বলে দিন।' উত্তরে তিনি বললেন, ''রমাযান মাসের রোযা।'' লোকটি বলল, 'এ ছাড়া অন্য কিছু কি আমার কর্তব্য আছে?' তিনি বললেন, ''না, তবে যদি তুমি নফল রোযা রাখ, তাহলে ভিন্ন কথা।''[2]

আর মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়ে একমত যে, রমাযানের রোযা ফরয। তা ইসলামের অন্যতম রুকন, খুঁটি বা ভিত্তি। এ ফরয হওয়ার কথা সহজ উপায়ে সকলের জানা। সুতরাং যে কেউ তা অস্বীকার করবে সে মুরতাদ্ কাফের। তাকে তওবা করার জন্য আহবান করা হবে। তাতে

সে তওবা করলে এবং রোযা ফরয বলে মেনে নিলে উত্তম। নচেৎ, (সরকার) তাকে কাফের অবস্থায় হত্যা করবে।[3]

[1] (বুখারী ৮, মুসলিম ১৬নং, তিরমিযী, নাসাঈ)

[2] (বুখারী, ১৮৯১, মুসলিম)

[3] (ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩৮৩, ফুসূল ৪-৫পৃঃ)

রমাযান মাসের বৈশিষ্ট্য ও তার রোযার মাহাত্ম্য

রমাযান শব্দটি 'রম্য' ধাতু থেকে উৎপত্তি। এর মানে হল কঠিন গরম, জ্বালিয়ে দেওয়া। চান্দ্র মাসগুলোর যখন প্রাচীন নাম বাদ দিয়ে আরবী ভাষায় নতুন নাম দেওয়া হয়, তখন রমাযান মাসটি পরে কঠিন গরমের সময়। আর তাকেই ভিত্তি করে তার 'রামাযান' নামকরণ করা হয়। অবশ্য রমাযান মাসের রোযা ফরয হওয়ার পর তার নাম সার্থক হয়। যেহেতু উক্ত মাসে ক্ষুৎপিপাসায় রোযাদারের পেট জ্বলে থাকে।

রমাযানের মাসের একাধিক এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্যান্য মাসে নেই। যেমনঃ-

১। এই মাসের নাম কুরআন মাজীদে উল্লেখিত হয়েছে। (দ্রষ্টব্য কুরআনুল কারীম ২/১৮৫) পক্ষান্তরে অন্য মাসের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

২। এই মাস আসার সময় মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবাগণকে সুসংবাদ দিতেন।

৩। রমাযান হল বর্কতময় পবিত্র মাস। এ মাসে বর্কত অবতীর্ণ হয়।

৪। মহান আল্লাহ এই মাসের রোযা ফরয করেছেন।

৫। এই মাসে জান্নাতের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করা হয় এবং একটা দ্বারও বন্ধ থাকে না।

৬। এই মাসে রহমতের সকল দরজা খুলে দেওয়া হয়।[1]

৭। এই মাসে জাহান্নামের দ্বারসমূহ রুদ্ধ করা হয় এবং একটা দ্বারও খোলা থাকে না।

উল্লেখ্য যে, বেহেশ্তের সকল দরজা খুলে দেওয়ার কারণ হল, যাতে করে আমলকারী তা শুনে আমলে আগ্রহ ও উৎসাহ পায় এবং তাতে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আর দোযখের সকল দরজা বন্ধ করার কারণ হল, যাতে আমলকারী এই মাসে পাপে লিপ্ত না হয় এবং তাতে প্রবেশ না করে বসে। এর অর্থ এই নয় যে, যে ব্যক্তি রমাযান মাসে মারা যাবে সে বিনা হিসাবে সোজা বেহেশ্তে যাবে।[2]

৮। উচ্ছৃঙ্খল শয়তান দলকে এই মাসে বন্দী করে রাখা হয়।[3] অর্থাৎ, তাদেরকে শিকল ও বেড়ি দিয়ে বেঁধে আটকে রাখা হয়। ফলে তারা রমাযানে সেই পাপাচরণ ঘটাতে সক্ষম হয়

না, যতটা অন্য মাসে সক্ষম হয়। এ জন্য দেখা যায় যে, অন্যান্য মাসের তুলনায় এই মাসে শয়তানের কুমন্ত্রণা, চক্রান্ত এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করার কাজ কম ঘটে থাকে। বরং শয়তান রমাযান মাসকে ভয় করে, যেমন ভয় করে আযান ও ইকামতকে এবং তার শব্দ শুনে পাদতে পাদতে পলায়ন করে।

কিন্তু আমরা এ মাসেও যে পাপাচরণ ও শয়তানী কর্মকান্ড ঘটতে দেখে থাকি তা উক্ত কথার বিরোধী নয়। কারণ, পাপ কেবল শয়তানই ঘটায় না। বরং মন্দপ্রবণ মানুষের মনও এমনিতেই পাপ করে থাকে। যে মন শয়তানের কুমন্ত্রণা সত্বর গ্রহণ করে থাকে এবং শয়তানের তাসীর কম বা বন্ধ হয়ে গেলেও সেই মন নিজেই পাপ সৃষ্টি করে। এটি হল মানুষের 'নাফ্সে আম্মারাহ।' যে নাফ্স বা মন শয়তানের প্রতিনিধিত্ব করে এবং সেই পাপাচরণ ঘটিয়ে থাকে। নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিক।[4]

৯। রমাযান মাসে আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়।[5]

১০। এই মাসে দুআ কবুল হয়। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, "(রমাযান মাসের) প্রত্যেক রাতে ও দিনে প্রত্যেক মুসলিমের দুআ কবুল করা হয়।"[6]

১১। এই মাসে রয়েছে এমন একটি রাত্রি, যা হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি এই রাতের মঙ্গল থেকে বঞ্চিত হয়, সে আসলে সকল মঙ্গল থেকে বঞ্চিত। আর একান্ত বঞ্চিত ব্যক্তি ছাড়া সে মঙ্গল থেকে কেউ বঞ্চিত হয় না।[7]

১২। এই মাসের প্রত্যেক রাত্রে একজন আহবানকারী (ফিরিশ্তা) আহবান করে বলেন, 'ওহে কল্যাণকামী! তুমি অগ্রসর হও। আর ওহে মন্দকামী! তুমি ক্ষান্ত হও।'

১৩। এই মাসের প্রত্যেক রাত্রে মহান আল্লাহ দোযখ থেকে মুসলিম মুক্ত করে থাকেন।[8]

১৪। রমাযান মাস হল সবর ও ধৈর্যের মাস। যেহেতু রোযা ছাড়া অন্য ইবাদতে সেইরূপ ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয় না। মুসলিম এই মাসে পূর্ণ ৩০ বা ২৯টি দিনই পানাহার, স্ত্রী-মিলন এবং অন্যান্য রোযাবিরোধী সকল কর্ম থেকে ধৈর্যের সাথে বিরত থাকে। তাই মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এই মাসকে 'ধৈর্যের মাস' বলে অভিহিত করেছেন।[9] আর তিনি বলেছেন, "ধৈর্যের (রমাযান) মাসে রোযা আর প্রত্যেক মাসের তিনটি রোযা অন্তরের বিদ্বেষ ও খট্কা দূর করে দেয়।"[10]

১৫। রমাযান হল কুরআনের মাস। কুরআন পঠন-পাঠন ও তেলাঅতের মাস। প্রশংসার অধিকারী বিজ্ঞানময় আল্লাহর তরফ থেকে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার মাস। এই মাসে কুরআন 'লাওহে মাহফূয' থেকে দুনিয়ার আসমানের প্রতি অবতীর্ণ হয়, অথবা কুরআন অবতীর্ণ হতে শুরু হয় এই পবিত্র মাসে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

“রমাযান মাস; যে মাসে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে রোযা রাখে।”
(কুরআনুল কারীম ২/১৮৫)
আর কেবল কুরআনই নয়; বরং অন্যান্য আসমানী গ্রন্থসমূহও অবতীর্ণ হয়েছে এই বর্কতময় মাসেই। “ইবরাহীমের সহীফাসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে রমাযান মাসের প্রথম রাতে, তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছে রমাযানের সপ্তম রাতে, ইঞ্জীল অবতীর্ণ হয়েছে রমাযানের ১৪তম রাতে, যাবূর অবতীর্ণ হয়েছে রমাযানের ১৯শের রাতে এবং কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে রমাযানের ২৫শের রাতে।”[11]
১৬। রমাযান মাসে বিস্ময়কর বড় বড় বিজয় দানের মাধ্যমে মহান আল্লাহ ইসলামকে সাহায্য করেছেন, মুসলিমদেরকে মর্যাদা দিয়েছেন। এই মাসেই বদর যুদ্ধে বদর প্রান্তরে মুসলিমদের আধ্যাত্মিক শক্তিমত্তা, ঈমানী ভিত্তির সুদৃঢ়তা এবং প্রতীতির অবিচলতা প্রকাশ পায়। আল্লাহ তাআলা এই দিনে তাঁদেরকে সাহায্য করেন এবং শত্রুর উপর বিজয়ী করেন।
অষ্টম হিজরীর রমাযান মাসে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁদেরকে সাহায্য করেন। যার পর মুসলিমরা স্থিতিশীলতা পেলেন এবং ইসলাম পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করল।[12]
১৭। রমাযান মাসে কোন কোন আমলের বহুগুণ সওয়াব লাভ হয়। এ মাসে উমরাহ আদায় আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে হজ্জ করার সমান।[13]
পক্ষান্তরে এ মাসের রোযা রাখার সওয়াব প্রসঙ্গে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন,
(ক) “যে ব্যক্তি ঈমান ও বিশ্বাসের সাথে এবং সওয়াবের আশা রেখে রমাযানের রোযা রাখবে তারও পূর্বেকার পাপরাশি মাফ হয়ে যাবে।”[14]
(খ) “পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমআহ হতে অপর জুমআহ পর্যন্ত ও এক রমাযান অপর রমাযান পর্যন্ত উভয়ের মধ্যবর্তীকালের সংঘটিত পাপরাশিকে মোচন করে দেয়; যদি কাবীরা গোনাহ থেকে দূরে থাকা হয় তবে।”[15]
(গ) এক ব্যক্তি মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে হাজির হয়ে আরজ করল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনার অভিমত কি? যদি আমি সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আপনি আল্লাহর রসূল, পাঁচ-ওয়াক্ত নামায পড়ি, যাকাত আদায় করি এবং রমাযানের রোযা পালন করি, তাহলে আমি কাদের দলভুক্ত হব?’ উত্তরে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, “তুমি সিদ্দীক ও শহীদগণের দলভুক্ত হবে।”[16]
[1] (সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ১৩০৭, সহীহুল জামেইস সাগীর, আলবানী ৪৭১নং)

[2] (ফাসিঃ ২২পৃঃ)

[3] (বুখারী ১৮০, মুসলিম ১০৭৯নং)

[4] (দুরুসু রামাযান অকাফাত লিস্-সায়েমীন ২১পৃঃ)

[5] (বুখারী ১৮৯৯, আহমাদ, মুসনাদ, নাসাঈ, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ১৮৬৮নং)

[6] (বাযযার, সহীহ তারগীব, আলবানী ৯৮৮নং)

[7] (সহীহ ইবনে মাজাহ, আলবানী ১৩৩৩, সহীহুল জামেইস সাগীর, আলবানী ৩৫১৯নং)

[8] (আহমাদ, মুসনাদ ৪/৩১২, ৫/৪১১, নাসাঈ, সহীহ ইবনে মাজাহ, আলবানী ১৩৩১নং)

[9] (সহীহুল জামেইস সাগীর, আলবানী ৩৮০৩নং)

[10] (বায্যার, ত্বাবারানী, মু'জাম, ইবনে হিববান, সহীহ, সহীহুল জামেইস সাগীর, আলবানী ৩৮০৪নং)

[11] (আহমাদ, মুসনাদ, ত্বাবারানী, মু'জাম, সহীহুল জামেইস সাগীর, আলবানী ১৪৯৭, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ১৫৭৫নং)

[12] (সাওমু রামাযান ৮-১৩পৃঃ)

[13] (বুখারী ১৮৬৩, মুসলিম ১২৫৬, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী, সুনান)

[14] (বুখারী ৩৮, ১৯০৮, মুসলিম ৭৬০, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

[15] (আহমাদ, মুসনাদ ২/৩৫৯, ৪০০, ৪১৪, মুসলিম ২৩৩নং)

[16] (বায্যার, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ, ইবনে হিববান, সহীহ, সহীহ তারগীব, আলবানী ৯৮৯নং)

বিনা ওযরে রোযা ত্যাগ করার সাজা

যে ব্যক্তি বিনা ওজরে রমাযানের রোযা ত্যাগ করে সে ব্যক্তির দুটি কারণ হতে পারে; হয় সে তা ফরয বলে অস্বীকার করছে এবং তাকে একটি ইবাদত বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে না, (নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিক।) আর না হয় সে আলসেমি করে তা রাখছে না।

সুতরাং যদি সে রোযা ফরয বলে অস্বীকার করে ও বলে যে, রোযা শরীয়তে ফরয নয়, তাহলে সে কাফের ও মুরতাদ্দ; যেমন এ কথা পূর্বে বলা হয়েছে। কারণ, সে দ্বীনের সর্ববাদিসম্মত এমন একটি ব্যাপারকে অস্বীকার করে যা আম-খাস সকলের পক্ষে জানা সহজ এবং যা ইসলামের একটি রুকন।

আর তার এই মুরতাদ্দ হওয়ার ফলে একজন মুরতাদ্দের মাল ও পরিবারের ব্যাপারে যা বিধান আছে তা কার্যকর হবে। সরকারের কাছে সে হত্যাযোগ্য অপরাধী বলে গণ্য হবে। তার গোসল-কাফন ও জানাযা হবে না এবং মুসলিমদের গোরস্থানে তাকে দাফন করাও যাবে না। অবশ্য যদি কেউ নওমুসলিম হওয়ার ফলে অথবা ইসলামী পরিবেশ ও উলামা থেকে দূরে থাকার ফলে এ ধরনের কথা বলে থাকে, তাহলে তার কথা ভিন্ন।

পক্ষান্তরে যদি কেউ আলসেমি করে রোযা না রাখে, তাহলে ভয়ানক কঠিন শাস্তি তার জন্য অপেক্ষা করছে।

আবূ উমামাহ বাহেলী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন যে, ''একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম; এমন সময় (স্বপ্নে) আমার নিকট দুই ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। তাঁরা আমার উভয় বাহুর ঊর্ধ্বাংশে ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ের নিকট উপস্থিত করলেন এবং বললেন, 'আপনি এই পাহাড়ে চড়ুন।' আমি বললাম, 'এ পাহাড়ে চড়তে আমি অক্ষম।' তাঁরা বললেন, 'আমরা আপনার জন্য চড়া সহজ করে দেব।' সুতরাং আমি চড়ে গেলাম। অবশেষে যখন পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছলাম তখন বেশ কিছু চিৎকার-ধ্বনি শুনতে পেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম 'এ চিৎকার-ধ্বনি কাদের?' তাঁরা বললেন, 'এ হল জাহান্নামবাসীদের চীৎকার-ধ্বনি।' পুনরায় তাঁরা আমাকে নিয়ে চলতে লাগলেন। হঠাৎ দেখলাম একদল লোক তাদের পায়ের গোড়ালির উপর মোটা শিরায় (বাঁধা অবস্থায়) লটকানো আছে, তাদের কশগুলো কেটে ও ছিঁড়ে আছে এবং কশ বেয়ে রক্তও ঝরছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, আমি বললাম, 'ওরা কারা?' তাঁরা বললেন, 'ওরা হল তারা; যারা সময় হওয়ার পূর্বে-পূর্বেই ইফতার করে নিত---।''[1]

'ওরা হল তারা; যারা সময় হওয়ার পূর্বে-পূর্বেই ইফতার করে নিত---।' রোযা রাখার পরেও তাদের যদি ঐ অবস্থা হয়, তাহলে যারা পূর্ণ দিন মূলেই রোযা রাখে না, তাদের অবস্থা এবং যারা পূর্ণ মাসই রোযা রাখে না, তাদের অবস্থা যে কত করুণ, কত সঙ্গিন তা অনুমেয়!

মুস্তাফা মুহাম্মাদ আম্মারাহ তাঁর তারগীবের টীকায়[2] বলেন, 'উক্ত হাদীসের ভাবার্থ এই যে, মহান আল্লাহ তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে রোযা ভঙ্গকারীদের আযাব সম্বন্ধে

ওয়াকেফহাল করেছেন। তিনি দেখেছেন, তাদের সেই দুরবস্থা; তাদের আকার-আকৃতি ছিল বড় মর্মান্তিক ও নিকৃষ্ট। কঠিন যন্ত্রণায় তারা কুকুর ও নেকড়ের মত চিৎকার করছে। তারা সাহায্য প্রার্থনা করছে অথচ কোন সাহায্যকারী নেই। তাদের পায়ের শেষ প্রান্তে (গোড়ালির উপর মোটা শিরায়) জাহান্নামের আঁকুশি দিয়ে কসাইখানার যবাই করা ছাগলের মত তাদেরকে নিম্নমুখে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আর তাদের কশ বেয়ে মুখভর্তি রক্ত ঝরছে! আশা করি নাফরমান বেরোযাদার মুসলিম সম্প্রদায় এই আযাবের কথা জেনে আল্লাহর নিকট তওবা করবে এবং তাঁর সেই আযাবকে ভয় করে যথানিয়মে রোযা পালন করবে।'

ইমাম যাহাবী (রঃ) বলেন, 'মুমিনদের নিকটে এ কথা স্থির-সিদ্ধান্ত যে, যে ব্যক্তি কোন রোগ ও ওজর না থাকা সত্ত্বেও রমাযানের রোযা ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি একজন ব্যভিচারী ও মদ্যপায়ী থেকেও নিকৃষ্ট। বরং মুসলিমরা তার ইসলামে সন্দেহ পোষণ করে এবং ধারণা করে যে, সে একজন নাস্তিক ও নৈতিক শৈথিল্যপূর্ণ মানুষ।[3]

[1] (ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ, ইবনে হিববান, সহীহ, বাইহাকী ৪/২১৬, হাকেম, মুস্তাদ্রাক ১/৪৩০, সহীহ তারগীব, আলবানী ৯৯১নং)

[2] (২/১০৯)

[3] (মাজমূ' ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়্যাহ ২৫/২২৫, আল-কাবায়ের, যাহাবী ৪৯পৃঃ, ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩৮৪, ফাইযুর রাহীমির রাহমান, ফী আহকামি অমাওয়াইযি রামাযান, আব্দুল্লাহ ত্বাইয়ার ২০-২১পৃঃ, তাওজীহাতুন অফাওয়াএদ লিসসা-য়েমীনা অসসায়েমাত ৭৪পৃঃ)

মাস প্রমাণ হবে কিভাবে?

রমাযান মাস প্রবেশ হওয়া প্রমাণ হবে দুয়ের মধ্যে একভাবেঃ-

১। রমাযানের চাঁদ দেখে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

(فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে রোযা রাখে। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৫)

আর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ''তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে ঈদ কর। কিন্তু যদি আকাশে মেঘ থাকে, তাহলে গণনায় ৩০ পুরা করে নাও।''[1] তিনি আরো বলেন, ''তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে ঈদ কর। কিন্তু যদি আকাশে মেঘ থাকে, তাহলে শা'বানের গুনতি ৩০ পূর্ণ করে নাও।''

বলা বাহুল্য, হাদীসে এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে, রমাযানের রোযা ফরয হওয়া তথা তা শুরু করার ব্যাপারটা চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল। আর এর মানেই হল, চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রাখা নিষিদ্ধ।

সাক্ষ্য দ্বারা মাস প্রমাণঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

(يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ، قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ)

অর্থাৎ, ওরা আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, তা হল মানুষ ও হজ্জের জন্য সময় নির্দেশক। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৯)

মহান আল্লাহ চাঁদকে মানুষের জন্য সময়-নির্দেশক হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। এর দ্বারা মানুষ নিজেদের ইবাদত ও পার্থিব জীবনের সময় ও তারীখ নির্ধারণ করতে পারে। সুতরাং বান্দার প্রতি তাঁর খাস রহমত এই যে, তিনি ফরয রোযা শুরু হওয়ার বিষয়টা একটি এমন স্পষ্ট জিনিস ও প্রকট চিহ্নের উপর নির্ভরশীল করেছেন, যা সকল মানুষই জানে।

অবশ্য রোযা ওয়াজেব হওয়ার জন্য এ শর্ত নয় যে, প্রত্যেক মুসলিমকেই চাঁদ দেখতে হবে। বরং কিছু সংখ্যক লোক দেখলে, বরং - সঠিক মতে- একজন দেখলেই; যদি সে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি হয়, তাহলে তার দেখা মতে সকলের জন্য রোযা রাখা জরুরী হয়ে যাবে। অবশ্য তাদের সকলের চন্দ্রের উদয়-স্থল এক হয় তবে।[2]

ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, একদা লোকেরা নতুন চাঁদ দেখতে জমায়েত হল। আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে খবর দিলাম যে, আমি চাঁদ দেখেছি। তিনি আমার এ খবরে রোযা রাখলেন এবং লোকেদেরকে রোযা রাখতে আদেশ করলেন।[3]

২। রমাযান প্রবেশ হওয়ার কথা প্রমাণ করার দ্বিতীয় উপায় হল, (চাঁদ দেখা না গেলে) শা'বান মাসকে ৩০ দিন পূর্ণ করে নেওয়া। (অবশ্য এর জন্য শর্ত হল শা'বান মাসের শুরুর হিসাব রাখা।) এ ব্যাপারে পূর্বে উল্লেখিত দুটি হাদীস আমাদেরকে পথনির্দেশ করে। যাতে বলা হয়েছে, "যদি আকাশে মেঘ থাকে, তাহলে শা'বানের গুনতি ৩০ পূর্ণ করে নাও।"

জ্যোতিষ-গণনার উপর নির্ভর করা যাবে নাঃ

উপর্যুক্ত দুটি উপায় ছাড়া অন্য উপায়ে মাস প্রবেশ হওয়ার কথা প্রমাণ করা যাবে না। সুতরাং জ্যোতিষ-গণনা বা পঞ্জিকা মতে রমাযান মাস ধরে নিয়ে রোযা ফরয হবে না। বলা বাহুল্য, যদি জ্যোতিষীদের হিসাব মতে আজকের রাত রমাযানের প্রথম তারীখ হয়, কিন্তু সন্ধ্যায় কেউই চাঁদ না দেখে থাকে, তাহলে রোযা রাখা যাবে না। যেহেতু শরীয়ত রোযা রাখার বিধানকে একটি বাহ্যিকভাবে উপলব্ধ জিনিসের উপর নির্ভরশীল করে দিয়েছে। আর তা হল চাঁদ দেখা।[4] তা ছাড়া পঞ্জিকার হিসাব নির্ভুল নয়। এক এলাকায় সচল হলেও অন্য এলাকায় অচল। অতএব তার উপর ভরসা করে চোখ বুজে রোযা রাখা বৈধ নয়।

পঞ্জিকার হিসাবের উপর নির্ভর করার কথা শরীয়ত ও বিবেকে স্বীকৃত নয়। কেননা, মুসলিম উম্মাহ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর নবুঅত কাল থেকে নিয়ে আজও পর্যন্ত চাঁদ দেখার উপরই নির্ভর করে; হিসাবের উপর ভরসা না করে, কেবল মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণে রোযা রেখে আসছে। যে সম্মানিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, "আমরা হলাম নিরক্ষর জাতি। আমরা লিখাপড়া জানি না এবং হিসাবও জানি না। মাস কখনো এই রকম হয়, কখনো এই রকম হয়। অর্থাৎ, কখনো ২৯ দিনে হয় এবং কখনো ৩০ দিনে।"[5]

হাফেয ইবনে হাজার উক্ত হাদীসের টীকায় বলেন, এখানে 'হিসাব' বলতে 'জ্যোতিষী হিসাব'কে বুঝানো হয়েছে। আর তখন এ হিসাব খুবই কম সংখ্যক লোক ছাড়া কেউই জানত না। তাই রোযা রাখা এবং অন্যান্য ব্যাপার চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল করে দেওয়া হয়েছে। যাতে এ বিষয়ে লোকেরা অসুবিধা তথা জ্যেতিষী গণনার কষ্ট থেকে রেহাই পায়।

পরবর্তীকালে কিছু লোক এ হিসাব শিখলেও রোযা রাখা-না রাখার বিষয়টা এইভাবেই চলতে থাকল। বরং হাদীসের প্রকাশ্য উক্তি মূলতঃ হিসাবের উপর নির্ভর না করতেই ইঙ্গিত করে। আর এ কথা আরো স্পষ্ট করে দেয় পূর্বোক্ত হাদীস। যাতে বলা হয়েছে, "যদি আকাশে মেঘ থাকে, তাহলে শা'বানের গুনতি ৩০ পূর্ণ করে নাও।" এখানে এ কথা বলা হয়নি যে, যদি আকাশে মেঘ থাকে, তাহলে জ্যোতিষীদেরকে জিজ্ঞাসা করে নাও।"

এই বিধানের পশ্চাতে যুক্তি এই যে, আকাশ অপরিষ্কার থাকার সময় সংখ্যা পূরণ করে নিলে তাতে সকল আজ্ঞাপ্রাপ্ত মুসলিম সমান হয়ে যাবে এবং এর ফলে তাদের মধ্যে কোন প্রকার মতভেদ ও ঝগড়া অবশিষ্ট থাকবে না।[6]

চাঁদ দেখার জন্য দুরবীন ব্যবহারঃ

চাঁদ দেখার জন্য দূরের জিনিস কাছের করে দেখার যন্ত্র দূরবীন ব্যবহার করা দোষাবহ নয়। অবশ্য দূরবীন ব্যবহার করা বা চাঁদ দেখার জন্য তা ক্রয় করা ওয়াজেব নয়। কারণ, বাহ্যিকভাবে সুন্নাহ এ কথাই নির্দেশ করে যে, এর জন্য স্বাভাবিক দর্শনের উপর নির্ভর হবে, অস্বাভাবিক কোন দর্শনের উপর নয়। তবুও যদি কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি ঐ যন্ত্রের মাধ্যমে চাঁদ দেখে থাকে, তাহলে তার ঐ দেখার উপর আমল করা যাবে। বহু পূর্ব যুগেও লোকেরা ২৯শে শা'বান বা ২৯শে রমাযান উঁচু উঁচু মিনারে চড়ে ঐ শ্রেণীর যন্ত্রের মাধ্যমে চাঁদ দেখত। যাই বা হোক, যে কোন মাধ্যম ও উপায়ে, যে কোন প্রকারে চাঁদ দেখা গেলে সেই দেখার উপর আমল করা জরুরী হবে। কেননা, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী এ ব্যাপারে সাধারণ। তিনি বলেন, "তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে ঈদ কর।"[7]

উদয়স্থলের বিভিন্নতাঃ

অভিজ্ঞদের ঐক্যমতে চাঁদের উদয়স্থল ভিন্ন ভিন্ন এবং উদয়কালও অনুরূপ। আর এই ভিন্ন উদয়কালের ফলেই কোথাও চাঁদ দেখা যায়, কোথাও যায় না। সুতরাং উদয়-স্থল ভিন্ন হলে প্রত্যেক এলাকার জন্য পৃথক দর্শন জরুরী। পক্ষান্তরে উদয়স্থল বা উদয়কাল একই হলে একই এলাকাভুক্ত লোকেদের জন্য ২/১ জনের দর্শন অনুযায়ী আমল করা ওয়াজেব হবে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন, ''অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন এ মাসে রোযা রাখে।'' (কুরআনুল কারীম ২/১৮৫)

আর যাদের উদয়স্থল ওদের মত নয়, তাদের জন্য বলা যাবে না যে, ওরা চাঁদ দেখেছে; না প্রকৃতপক্ষে, আর না-ই আপাতদৃষ্টে। অথচ মহান আল্লাহ তাদের জন্য রোযা ফরয করেছেন, যারা চাঁদ দেখেছে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ''তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে ঈদ কর।'' এই আজ্ঞায় রোযা রাখার আদেশকে চাঁদ দেখার শর্ত-সাপেক্ষ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি এমন জায়গায় বাস করে, যে জায়গার উদয়স্থল যে চাঁদ দেখেছে তার উদয়স্থলের অনুরূপ নয়, সে ব্যক্তি (যেহেতু তার নিজের এলাকায় কেউ চাঁদ দেখেনি সেহেতু) আসলে চাঁদ দেখেনি; না প্রকৃতপক্ষে, আর না-ই আপাতদৃষ্টে।

পরন্তু মাসিক সময়কাল প্রাত্যহিক সময়কালের মতই। সুতরাং যেমন প্রত্যেক দেশ প্রাত্যহিক সেহরীর ও ইফতারের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন সময় ব্যবহার করে থাকে, ঠিক তেমনিই মাসিক রোযা শুরু ও শেষ হওয়ার সময় ভিন্ন ভিন্ন হওয়া জরুরী। আর এ কথা বিদিত যে, মুসলিমদের ঐক্যমতে দৈনিক সময়ের স্বতন্ত্র প্রভাব আছে। তাই যারা প্রাচ্যে বাস করে তারা তাদের আগে সেহরী খাওয়া বন্ধ করবে; যারা প্রতীচ্যে বাস করে। অনুরূপ প্রাচ্যের লোক প্রতীচ্যের লোকদের পূর্বে ইফতার করবে।

সুতরাং যখন দৈনিক সময়ে সূর্যের উদয়াস্ত কালের ভিন্নতা মেনে নিতে বাধ্য, তখন তারই সম্পূর্ণ অনুরূপ মাসের ব্যাপারেও চন্দ্রের উদয়কালের ভিন্নতাকে মেনে নিতে আমরা বাধ্য।

আর এ কথা বলা কারো জন্য যুক্তি সঙ্গত হবে না যে, যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)

''আর তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না (রাতের) কালো অন্ধকার থেকে ফজরের সাদা রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে।''(কুরআনুল কারীম ২/১৮৭)

এবং মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ''রাত যখন এদিক (পূর্ব গগণ) থেকে আগত হবে, দিন যখন এদিক (পশ্চিম গগণ) থেকে বিদায় নেবে এবং সূর্য যখন অস্ত যাবে, তখন রোযাদার ইফতার করবে।''[৪]

আর এ কথা কেউ বলতে পারে না যে, উক্ত নির্দেশ সারা বিশ্বের সকল দেশের মুসলিমদের জন্য ব্যাপক।

কুরাইব বলেন, একদা উম্মুল ফায্ল বিন্তুল হারেষ আমাকে শাম দেশে মুআবিয়ার নিকট পাঠালেন। আমি শাম (সিরিয়া) পৌঁছে তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করলাম। অতঃপর আমার শামে থাকা কালেই রমাযান শুরু হল। (বৃহস্পতিবার দিবাগত) জুমআর রাত্রে চাঁদ দেখলাম। অতঃপর মাসের শেষ দিকে মদ্বীনায় এলাম। আব্দুল্লাহ বিন আববাস (রাঃ) আমাকে চাঁদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কবে চাঁদ দেখেছ?' আমি বললাম, 'আমরা জুমআর রাত্রে দেখেছি।' তিনি বললেন, 'তুমি নিজে দেখেছ?' আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ। আর লোকেরাও দেখে রোযা রেখেছে এবং মুআবিয়াও রোযা রেখেছেন।' ইবনে আববাস (রাঃ) বললেন, 'কিন্তু আমরা তো (শুক্রবার দিবাগত) শনিবার রাত্রে চাঁদ দেখেছি। অতএব আমরা ৩০ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অথবা নতুন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রাখতে থাকব।' আমি বললাম, 'মুআবিয়ার দর্শন ও তাঁর রোযার খবর কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়?' তিনি বললেন, 'না। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে এ রকমই আদেশ দিয়েছেন।'[9]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) এই কথাকেই বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন যে, যে দেশের লোক চাঁদ দেখেছে তাদের এবং তাদের সামনের (পশ্চিম) দেশের লোকেদের জন্য রোযা রাখা ওয়াজেব। আর এ কথা গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন যে, যখনই কোন দেশে চাঁদ দেখা যাবে, তখনই তার পরবর্তী (পশ্চিমী) দেশে চাঁদ অবশ্য অবশ্যই দেখা যাবে। কেননা, সে দেশের সূর্য দেরীতে অস্ত যায়। এইভাবে যত দেরীতে সূর্য ডুববে, চাঁদ সূর্য থেকে তত দূর হবে এবং তত উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হবে। উদাহরণস্বরূপ যদি বাহরাইনে চাঁদ দেখা যায়, তাহলে তার পশ্চাতের দেশ নজ্দ (রিয়ায), হিজায (মক্কা-মদ্বীনা), মিসর ও মরক্কোতেও রোযা ওয়াজেব হবে। পক্ষান্তরে তার পূর্ব দিকের দেশ হিন্দ্, সিন্দ্ ও মা অরাআন নাহার (ইরান, পাকিস্তান ও ভারতের) লোকদের জন্য রোযা রাখা ওয়াজেব হবে না।[10]

তদনুরূপই বাংলাদেশে চাঁদ হয়েছে বলে পাকা খবর পাওয়া গেলে পশ্চিমবাংলার লোকেদের জন্য রোযা রাখা ওয়াজেব হবে; যদিও মেঘের কারণে সেখানে (পশ্চিম বাংলায়) চাঁদ না দেখা যায়।

[1] (বুখারী ১৯০০, মুসলিম ১০৮০নং)

[2] (ফাইযুর রাহীমির রাহমান, ফী আহকামি অমাওয়াইযি রামাযান ২৮পৃঃ)

[3] (আবূ দাউদ ২৩৪২, দারেমী, সুনান ২/৪, ইবনে হিববান, সহীহ ৮৭১নং, হাকেম, মুস্তাদ্রাক ১/৪২৩, দারাকুত্বনী, সুনান, বাইহাকী ৪/২১২, ইরওয়াউল গালীল, আলবানী ৪/১৬)

[4] (আশশারহুল মুমতে' ৬/৩১৪)

[5] (বুখারীঃ ১৯১৩নং)

[6] (ফাতহুল বারী ৪/১৫১)

[7] (সুআলান ফিস্‌-সিয়ামঃ ৩১পৃঃ)

[8] (বুখারী ১৯৪১, মুসলিম ১১০০, ১১০১, আবূ দাঊদ ২৩৫১, ২৩৫২, তিরমিযী, দারেমী, সুনান)

[9] (মুসলিম ১০৭৮ নং)

[10] (আশশারহুল মুমতে' ৬/৩২১-৩২২, ইবনে উসাইমীন, ফাসিঃ মুসনিদ ১৫পৃঃ, ইবনে জিবরীন, ফাসিঃ জিরাইসী ১০পৃঃ

রোযার মাসায়েল

রোযার গুরুত্বপূর্ণ মাসাইল আলকাউসারে একাধিকবার লেখা হয়েছে। প্রথমবার লেখা হয়েছিল ফিকহ ও ফতোয়ার নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহের উদ্ধৃতিতে। একবার হাদীস ও আছারের কিতাবাদির হাওয়ালাও যোগ করা হয়েছে। এবার এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে যে, মাসআলা উল্লেখ করে মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো না কোনো দলীল কিতাবুল্লাহ, সুন্নতে রাসূলুল্লাহ, আছারে সাহাবা, কিংবা অন্তত তাবেয়ী ইমামগণের ফতোয়া থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও এই প্রবন্ধে সকল মাসআলা আলোচিত হয়নি তবুও এই প্রয়াস দ্বারা ইনশাআল্লাহ নিম্নোক্ত সুফলগুলো পাওয়া যাবে। ১. সাধারণ পাঠকগণ আশ্বস্তি লাভ করবেন যে, ফিকহে হানাফীর মুফতা বিহী মাসায়েল দলীলভিত্তিক, যদিও সাধারণ পাঠকের সুবিধার্থে ফিকহের প্রাথমিক পর্যায়ের কিতাবপত্রে দলীল উল্লেখ করা হয় না। ২. সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ঐ সব বন্ধুদের আগ্রহকে কিছুটা বিবেচনা করা যারা দলীলসহ মাসায়েল জানতে চান যদিও তাদের এই চিন্তাধারা পুরোপুরি সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ দলীলের আলোকে সকল মাসআলা বোঝা তাদের জন্য সহজ নয়। এর জন্য তো উসূলুল ফিকহ ও কাওয়াইদুল ফিকহ-এর ইলম অপরিহার্য, তদ্রূপ দলীলের ভাষা সম্পর্কেও যথেষ্ট পান্ডিত্য প্রয়োজন। ৩. তালিবে ইলমদের মাঝে এই ধারা সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক যে, তারা শামী ও আলমগীরীর মাসায়েল আহকামুল কুরআন, সীরাত ও সুন্নাহ, হাদীস ও আছার এবং ফিকহুস সালাফের কিতাবসমূহের সাথে তুলনা করে পাঠ করবেন। যাতে ফিকহে মুদাল্লাল ও ফিকহে মুকারানের সাথে তাদের মুনাসাবাত তৈরি হয়।-তত্ত্বাবধায়ক

১)মাসআলা : প্রত্যেক সুস্থ মস্তিষ্ক বালেগ মুসলিমের উপর রমযানের রোযা ফরয। আল্লাহ তাআলা বলেন-

فمن شهد منكم الشهر فليصمه

অর্থ : সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে সে যেন অবশ্যই রোযা রাখে।-সূরা বাকারা : ১৮৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৫; রদ্দুল মুহতার ২/৩৭২

২)মাসআলা : শাবানের ২৯ তারিখ দিবাগত সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে পরদিন থেকে রোযা রাখতে হবে। নতুবা শাবানের ৩০ দিন পূর্ণ করার পর রোযা রাখা শুরু করবে।

عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان، فقال :لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه.

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, '(রমযানের) চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রাখবে না এবং (শাওয়ালের) চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা রাখা বন্ধ করবে না।'-সহীহ মুসলিম ১/৩৪৭

অন্য হাদীসে আছে, '(শাবানের ২৯ দিন পূর্ণ করার পর) তোমরা যদি রমযানের চাঁদ না দেখ তাহলে শাবান মাস ৩০ দিন পূর্ণ করবে।'-আলমুসান্নাফ, আবদুর রাযযাক হাদীস : ৭৩০১; আলবাহরুর রায়েক ২/২৬৩; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৭

৩)মাসআলা : আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে রোযা শুরুর জন্য এমন একজন ব্যক্তির চাঁদ দেখাই যথেষ্ট হবে, যার দ্বীনদার হওয়া প্রমাণিত কিংবা অন্তত বাহ্যিকভাবে দ্বীনদার।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. বলেন, 'একজন মরুবাসী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট (রমযানের) চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি একথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল?' সে বলল, 'হ্যাঁ।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সকলকে রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন।'-মুসতাদরাকে হাকিম ১/৪২৪; সুনানে আবু দাউদ ২৩৩৩; সুনানে নাসায়ী ২৪২২; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ৯৫৫৭; আলবাহরুর রায়েক ২/২৬৩; রদ্দুল মুহতার ২/৩৮৫

৪)মাসআলা : আকাশ পরিষ্কার থাকলে একজনের খবর যথেষ্ট নয়; বরং এত লোকের খবর প্রয়োজন, যার দ্বারা প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, চাঁদ দেখা গেছে। কেননা, যে বিষয়ে অনেকের আগ্রহ ও সংশ্লিষ্টতা থাকে তাতে দু' একজনের খবরের উপর নির্ভর করা যায় না।-আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৩৮; রদ্দুল মুহতার ৩/৩৮৮

৫)মাসআলা : কোনো ব্যক্তি একাকী চাঁদ দেখেছে, কিন্তু তার সাক্ষ্য গৃহিত হয়নি, এক্ষেত্রে তার জন্য ব্যক্তিগতভাবে রোযা রাখা উত্তম, জরুরি নয়।

এক ব্যক্তি উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর নিকট এসে বলল, 'আমি রযমানের চাঁদ দেখেছি।' উমর রা. জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার সাথে অন্য কেউ কি দেখেছে?' লোকটি বলল, 'না, আমি একাই দেখেছি।' উমর রা. বললেন, 'তুমি এখন কী করবে?' লোকটি বলল, '(আমি একা রোযা

রাখব না) সবাই যখন রোযা রাখবে আমিও তখন রোযা রাখব।' উমর রা. তাকে বাহবা দিয়ে বললেন, 'তুমি তো বড় ফিকহ ও প্রজ্ঞার অধিকারী।'-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক ৪/১৬৮; আলমুহাল্লা ৪/৩৭৮

ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, এমন ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা জরুরি না হলেও উত্তম হল রোযা রাখা।-বাদায়েউস সানায়ে ২/২২১

৬)মাসআলা : শাবান মাসের ২৯ ও ৩০ তারিখে রোযা রাখবে না; না রমযানের নিয়তে না নফলের নিয়তে। অবশ্য যে পূর্ব থেকেই কোনো নির্দিষ্ট দিবসে (যথা সোম ও মঙ্গলবার) নফল রোযা রেখে আসছে, আর ঘটনাক্রমে শাবানের ২৯ ও ৩০ তারিখে ঐ দিন পড়েছে তার জন্য এই তারিখেও নফল রোযা রাখা জায়েয।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهي رسول الله عليه وسلم أن يتعجل شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فيأتي ذلك على صومه.

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা রমযান মাসের একদিন বা দুই দিন পূর্ব থেকে রোযা রেখো না। তবে কারো যদি পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট কোনো দিন রোযা রাখার অভ্যাস থাকে আর ঐ দিন উক্ত তারিখ পড়ে যায় তাহলে সে ঐ দিন রোযা রাখতে পারে।'-সহীহ বুখারী ১/১৫৬, হাদীস : ১৯১; মুসানাফে আবদুর রাযযাক ৪/১৫৮, হাদীস : ৭৩১৫; জামে তিরমিযী ২/৩২; রদ্দুল মুহতার ২/৩৮২; বাদায়েউস সানায়ে ২/২১৭

নিয়ত

৭)মাসআলা : রোযার নিয়ত করা ফরয। নিয়ত অর্থ সংকল্প। যেমন মনে মনে এ সংকল্প করবে, আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আগামী কালের রোযা রাখছি। মুখে বলা জরুরি নয়। হাদীস শরীফে আছে, সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। সহীহ বুখারী ১/২; বাদায়েউস সানায়ে ২/২২৬

৮)মাসআলা : ফরয রোযার নিয়ত রাতেই করা উত্তম।

উম্মুল মুমিনীন হাফসা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له.

যে ব্যক্তি ফজরের আগে রোযা রাখার নিয়ত করবে না তার রোযা (পূর্ণাঙ্গ) হবে না।-সুনানে আবু দাউদ ১/৩৩৩; আলবাহরুর রায়েক ২/২৫৯-২৬০; বাদায়েউস সানায়ে ২/২২৯

৯)মাসআলা : রাতে নিয়ত করতে না পারলে দিনে সূর্য ঢলার প্রায় এক ঘণ্টা আগে নিয়ত করলেও রোযা হয়ে যাবে।

সালামা ইবনুল আকওয়া রা. বলেন, (আশুরার রোযা যখন ফরয ছিল তখন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলাম গোত্রের একজন ব্যক্তিকে ঘোষণা করতে বললেন, 'যে সকাল থেকে কিছু খায়নি সে বাকি দিন রোযা রাখবে। আর যে খেয়েছে সেও বাকি দিন রোযা রাখবে। কারণ আজ আশুরা-দিবস।'-সহীহ বুখারী ২০০৭

আবদুল করীম জাযারী রাহ. বলেন, কিছু লোক সকালে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিল। তখন উমর ইবনে আবদুল আযীয রাহ. বললেন, 'যে ব্যক্তি (ইতিমধ্যে কিছু) খেয়েছে সে বাকি দিন খাওয়া থেকে বিরত থাকবে। আর যে খায়নি সে বাকি দিন রোযা রাখবে।'-মুহাল্লা ৪/২৯৩; বাদায়েউস সানায়ে ২/২২৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৬

১০)মাসআলা : পুরো রমযানের জন্য একত্রে নিয়ত করা যথেষ্ট নয়; বরং প্রত্যেক রোযার নিয়ত পৃথক পৃথকভাবে করতে হবে। কারণ প্রতিটি রোযা ভিন্ন ভিন্ন আমল (ইবাদত)। আর প্রতিটি আমলের জন্যই নিয়ত করা জরুরি।

হাদীস শরীফে আছে, সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।-সহীহ বুখারী ১/২; আরো দেখুন : আলমুহাল্লা ৪/২৮৫; মাবসূত, সারাখসী ৩/৬০; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৫

১১)মাসআলা : রাতে রোযার নিয়ত করলেও সুবহে সাদিক পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী-মিলনের অবকাশ থাকে। এতে নিয়তের কোনো ক্ষতি হবে না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

রমযানের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সম্ভোগ হালাল করা হয়েছে।-বাকারা ২ : ১৮৭

১২)মাসআলা : নিয়তের সময় শুরু হয় পূর্বের দিনের সূর্যাস্তের পর থেকে। যেমন-মঙ্গলবারের রোযার নিয়ত সোমবার দিবাগত রাত তথা সূর্যাস্তের পর থেকে করা যায়। সোমবার সূর্যাস্তের পূর্বে মঙ্গলবারের রোযার নিয়ত করা যথেষ্ট নয়। কেননা, হাদীস শরীফে রাতে নিয়ত করার কথা বলা হয়েছে।-আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৪৩; রদ্দুল মুহতার ২/৩৭৭

সাহরী

১৩)মাসআলা : সাহরী খাওয়া সুন্নত। পেট ভরে খাওয়া জরুরি নয়, এক ঢোক পানি পান করলেও সাহরীর সুন্নত আদায় হবে।

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

تسحروا، فإن في السحور بركة.

'তোমরা সাহরী খাও। কেননা, সাহরীতে বরকত রয়েছে।'-সহীহ মুসলিম ১/৩৫০

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, সাহরী খাওয়া বরকতপূর্ণ কাজ। সুতরাং তোমরা তা পরিত্যাগ করো না। এক ঢোক পানি দিয়ে হলেও সাহরী কর। কারণ যারা সাহরী খায় আল্লাহ তাআলা তাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতারা তাদের জন্য রহমতের দুআ করেন।'-মুসনাদে আহমদ ৩/১২; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস : ৯০১০; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৩৪৭৬

১৪)মাসআলা : সুবহে সাদিকের কাছাকাছি সময় সাহরী খাওয়া মুস্তাহাব। তবে এত দেরি করা মাকরূহ যে, সুবহে সাদিক হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إنما معاشر الأنبياء أمرنا أن تعجل فطرنا وأن تؤخر سحورنا، قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح.

'সকল নবীকে সময় হওয়ার পরপরই ইফতার তাড়াতাড়ি করতে এবং সাহরী শেষ সময়ে খেতে আদেশ করা হয়েছে।'-আলমুজামুল আওসাত ২/৫২৬; মাজমাউয যাওয়াইদ ৩/৩৬৮

আমর ইবনে মায়মুন আলআওদী বলেন, 'সাহাবায়ে কেরাম দ্রুত ইফতার করতেন আর বিলম্বে সাহরী খেতেন।'-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস : ৭৫৯১; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৯০২৫

১৫)মাসআলা : দেরি না করে সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা মুস্তাহাব।

হাদীস শরীফে আছে,

لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.

'যতদিন মানুষ দেরি না করে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করবে ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে।'-সহীহ বুখারী ১/২৬৩

১৬)মাসআলা : মাগরিবের নামায পড়ার আগেই ইফতার করে নিবে, যেন সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করার সওয়াব পাওয়া যায়।

আনাস ইবনে মালিক রা. বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামায পড়ার আগে তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তাজা খেজুর না পেলে শুকনা খেজুর দ্বারা। আর তাও না পেলে এক ঢোক পানি দ্বারা ইফতার করতেন।'

-সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৬৯২

১৭)মাসআলা : খেজুর দ্বারা ইফতার করা মুস্তাহাব। খেজুর না পেলে পানি দ্বারা ইফতার করবে।

من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا يفطر على ماء، فإن الماء طهور.

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যার কাছে খেজুর আছে সে খেজুর দ্বারা ইফতার করবে। খেজুর না পেলে পানি দ্বারা ইফতার করবে। কেননা পানি হল পবিত্র।'-সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৬৯৪

আরো দেখুন : মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস ৭৫৮৬

ইফতারের সময় দুআ

ইফতারের সময় দুআ কবুল হয় তাই এ সময় বেশি বেশি দুআ-ইস্তিগফার করতে থাকবে। বিশেষত এই দুআ করবে-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ. رواه ابن ماجه، وقال البوصيري في الزوائد : هذا هديث صحيح، ورجاله ثقات.

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার সেই রহমতের উসীলায় প্রার্থনা করছি যা সকল বস্তুতে পরিবেষ্টিত, তুমি আমাকে মাফ করে দাও।-সুনানে ইবনে মাজাহ পৃ. ১২৫, হাদীস : ১৭৫৩

আর ইফতার গ্রহণের সময় এ দুআ পড়বে-

اَللهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.

হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্যই রোযা রেখেছিলাম এবং তোমার রিযিক দ্বারাই ইফতার করলাম।-সুনানে আবু দাউদ হাদীস : ২৩৫৮

ইফতারের পর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুআ পড়তেন-

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ. رواه أبو داود، وصححه الحاكم في المستدرك، ولم يتعقبه الذهبي.

পিপাসা দূর হল, শিরা-উপশিরা সতেজ হল আর আল্লাহ তাআলা চান তো রোযার সওয়াব লিপিবদ্ধ হল।-সুনানে আবু দাউদ ১/৩২১, হাদীস : ২৩৫৭; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস : ১৫৭৬

রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ

যেসব কারণে কাযা ও কাফফারা উভয়টি জরুরি

১)মাসআলা : রমযানে রোযা রেখে দিনে স্ত্রী সহবাস করলে বীর্যপাত না হলেও স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপর কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব হবে।

একটি দীর্ঘ হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বলল, আমি রোযা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কাফফারা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। দেখুন : সহীহ বুখারী ৬৭০৯; জামে তিরমিযী ৭২৪; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক ৭৪৫৭; মুসনাদে আহমদ ২/২৪১

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে (যে স্ত্রীসহবাসে লিপ্ত হয়েছিল) কাফফারা আদায়ের সাথে কাযা আদায়েরও আদেশ করেছিলেন।-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস ৭৪৬১; আলবাহরুর রায়েক ২/২৭৬

২)মাসআলা : রোযা রেখে স্বাভাবিক অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে কাযা ও কাফফারা উভয়টি জরুরি হবে।

হাদীস শরীফে আছে-

এক ব্যক্তি রমযানে রোযা রেখে (ইচ্ছাকৃতভাবে) পানাহার করল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আদেশ করলেন, যেন একটি দাস আযাদ করে বা দুই মাস রোযা রাখে বা ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়ায়।-সুনানে দারাকুতনী ২/১৯১

ইমাম যুহরী রাহ. বলেন, 'রমযানে রোযা রেখে যে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করবে তার হুকুম ইচ্ছাকৃতভাবে দিনে সহবাসকারীর অনুরূপ।' অর্থাৎ তাকে কাযা ও কাফফারা উভয়টি আদায় করতে হবে।-মাবসূত, সারাখসী ৩/৭৩; আলবাহরুর রায়েক ২/২৭৬

৩)মাসআলা : বিড়ি-সিগারেট, হুক্কা পান করলেও রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা ও কাফফারা উভয়টি জরুরি হবে।-রদ্দুল মুহতার ৩/৩৮৫

এই মাসআলার দলীল বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন : ঝাজরু আরবাবির রায়্যান আন শুরবিদ দুখান; তারবীহুল জিনান বিতাশরীহি হুকমি শুরবিদ দুখান, আল্লামা আবদুল হাই লাখনোবী রাহ.

৪)মাসআলা : সুবহে সাদিক হয়ে গেছে জানা সত্ত্বেও আযান শোনা যায়নি বা এখনো ভালোভাবে আলো ছড়ায়নি এ ধরনের ভিত্তিহীন অজুহাতে খানাপিনা করলে বা স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হলে কাযা-কাফফারা দু'টোই জরুরি হবে।-সূরা বাকারা : ১৮৭; মাআরিফুল কুরআন ১/৪৫৪-৪৫৫

কাফফারা আদায়ের নিয়ম

১)মাসআলা : একটি রোযার জন্য দুই মাস ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখতে হবে। কোনো কারণে ধারাবাহিকতা ছুটে গেলে পুনরায় নতুন করে রোযা রাখতে হবে। পেছনের রোযাগুলো কাফফারার রোযা হিসাবে ধর্তব্য হবে না। তবে মহিলাদের হায়েযের কারণে ধারাবাহিকতা নষ্ট হলে অসুবিধা নেই।

ইবরাহীম নাখায়ী রাহ. বলেন, 'যার উপর কাফফারা হিসাবে দুই মাস ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখা জরুরি সে যদি মাঝে অসুস্থ হওয়ার কারণে রোযা রাখতে না পারে, তাহলে আবার নতুন করে রোযা রাখা শুরু করবে।'-আলমুহাল্লা ৪/৩৩১; মাবসূত, সারাখসী ৭/১৪; আলবাহরুর রায়েক ২/২৭৭; আলমুহীতুল বুরহানী ৫/১৯৬

যেসব কারণে শুধু কাযা করতে হয়

২)মাসআলা : অযু বা গোসলের সময় রোযার কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে গলার ভেতর পানি চলে গেলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। তাই রোযা অবস্থায় অযু-গোসলের সময় নাকের নরম স্থানে পানি পৌঁছানো এবং গড়গড়াসহ কুলি করবে না।

লাকিত ইবনে সাবিরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

بالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائما.

'(অযু-গোসলের সময়) ভালোভাবে নাকে পানি দাও তবে রোযা অবস্থায় নয়।'-সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ২৩৬৩ সুনানে তিরমিযী, হাদীস : ৭৮৫

সুফিয়ান সাওরী রাহ. বলেন, 'রোযা অবস্থায় কুলি করতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে গলার ভেতর পানি চলে গেলে রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং তা কাযা করতে হবে।-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস : ৭৩৮০

আরো দেখুন : মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ৯৮৪৪-৯৮৪৭; ফাতাওয়া শামী ২/৪০১

৩)মাসআলা : যা সাধারণত আহারযোগ্য নয় বা কোনো উপকারে আসে না, তা খেলেও রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা করতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. ও ইকরিমা রাহ. বলেন,

‘(পেটে) কোনো কিছু প্রবেশ করলে রোযা ভেঙ্গে যায়। কোনো কিছু বের হওয়ার দ্বারা রোযা ভাঙ্গে না।’-সহীহ বুখারী ১/২৬০ (তা’লীক); বাদায়েউস সানায়ে ২/২৫৫; রদ্দুল মুহতার ২/৪১০

৪)মাসআলা : দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে যদি তা থুথুর সাথে ভেতরে চলে যায় তবে রক্তের পরিমাণ থুথুর সমান বা বেশি হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।-আলবাহরুর রায়েক ২/২৭৩; রদ্দুল মুহতার ২/৩৯৬

৫)মাসআলা : হস্তমৈথুনে বীর্যপাত হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। আর এটা যে ভয়াবহ গুনাহের কাজ তা বলাই বাহুল্য।

হাদীস শরীফে কামেচ্ছা চরিতার্থ করা থেকে বিরত থাকাকে রোযার অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, ঐ সত্ত্বার কসম, যার হাতে আমার জান। রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তাআলার নিকট মেশকের চেয়েও বেশি প্রিয় (আল্লাহ তাআলা বলেন,) রোযাদার আমার জন্য পানাহার করা থেকে এবং কামেচ্ছা চরিতার্থ করা থেকে বিরত থাকে।-সহীহ বুখারী ১/২৫৪; আলবাহরুর রায়েক ২/২৭২; ফাতাওয়া শামী ২/৩৯৯

৬)মাসআলা : মুখে বমি চলে আসার পর ইচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেললে রোযা ভেঙ্গে যাবে। যদিও তা পরিমাণে অল্প হয়।-আলবাহরুর রায়েক ২/২৭৪; আদ্দুররুল মুখতার ২/৪১৫

৭)মাসআলা : রোযা অবস্থায় হায়েয বা নেফাস শুরু হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। পরে তা কাযা করতে হবে।

আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহায় মহিলাদের লক্ষ্য করে বললেন-

أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن بلى، قال : فذلك من نقصان دينها.

মহিলারা তো ঋতুস্রাবের সময় রোযা রাখতে পারে না এবং নামাযও পড়তে পারে না। এটা তোমাদের দ্বীনের অসম্পূর্ণতা।-সহীহ বুখারী ১/৪৪; শরহু মুখতাসারিত তহাবী ২/৪৪০; আননুতাফ ফিলফাতাওয়া ১০০

* পেটের এমন ক্ষতে ওষুধ লাগালে রোযা ভেঙ্গে যাবে, যা দিয়ে ওষুধ পেটের ভেতর চলে যায়। বিশেষ প্রয়োজনে এমন ক্ষতে ওষুধ লাগালে পরে সে রোযার কাযা করে নিতে হবে।-ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৪; রদ্দুল মুহতার ২/৪০২

* নাকে ওষুধ বা পানি দিলে তা যদি গলার ভেতরে চলে যায় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা করতে হবে।

* মলদ্বারের ভেতর ওষুধ বা পানি ইত্যাদি গেলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত-

ذكر عنده الوضوء من الطعام، قال الأعمش مرة والحجامة للصائم، فقال : إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج.

শরীর থেকে (কোনো কিছু) বের হলে অযু করতে হয়, প্রবেশ করলে নয়। পক্ষান্তরে রোযা এর উল্টো। রোযার ক্ষেত্রে (কোনো কিছু শরীরে) প্রবেশ করলে রোযা ভেঙ্গে যায়, বের হলে নয় (তবে বীর্যপাতের প্রসঙ্গটি ভিন্ন)।-ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৪; রদ্দুল মুহতার ২/৪০২

৮)মাসআলা : সুবহে সাদিকের পর সাহরীর সময় আছে ভেবে পানাহার বা স্ত্রীসঙ্গম করলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। তেমনি ইফতারির সময় হয়ে গেছে ভেবে
সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করে নিলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।-আদ্দুররুল মুখতার ২/৪০৫; আলবাহরুর রায়েক ২/২৯১

৯)মাসআলা : রোযা রাখা অবস্থায় ভুলবশত পানাহার করে রোযা নষ্ট হয়ে গেছে ভেবে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং কাযা করা জরুরি হবে।

* অনিচ্ছাকৃত বমি হওয়ার কারণে রোযা নষ্ট হয়ে গেছে মনে করে রোযা ভেঙ্গে ফেললে কাযা করতে হবে।

আউন রাহ. থেকে বর্ণিত, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রাহ. রাত্র বাকি আছে ভেবে সাহরী খেলেন। তারপর জানতে পারলেন, তিনি সুবহে সাদিকের পর সাহরী করেছেন তখন তিনি বললেন, 'আমি আজ রোযাদার নই।' (অর্থাৎ আমাকে এ রোযার কাযা করতে হবে)।-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৬/১৪৯

আলী ইবনে হানযালা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রোযার মাসে ওমর রা.-এর নিকট ছিলেন। তার নিকট পানীয় পেশ করা হল। উপস্থিত লোকদের কেউ কেউ সূর্য ডুবে গেছে ভেবে তা পান করে ফেলল। এরপর মুয়াযযিন আওয়াজ দিল, আমীরুল মুমিনীন! সূর্য এখনো ডুবেনি। তখন ওমর রা. বললেন, 'যারা ইফতারি করে ফেলেছে তারা একটি রোযা কাযা করবে। আর যারা ইফতারি করেনি তারা সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।'-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৬/১৫০; আদ্দুররুল মুখতার ২/৪০১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৬

যেসব কারণে রোযা ভাঙে না

এমন কিছু কাজ আছে, যার দ্বারা রোযার কোনো ক্ষতি হয় না। অথচ অনেকে এগুলোকে রোযা ভঙ্গের কারণ মনে করে। ফলে এমন কোনো কাজ হয়ে গেলে রোযা ভেঙে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃত পানাহার করে। পক্ষান্তরে কেউ কেউ এসব কাজ পরিহার করতে গিয়ে অযথা কষ্ট ভোগ করে। সুতরাং এসব বিষয়েও সকল রোযাদার অবগত হওয়া জরুরি।

১)মাসআলা : কোনো রোযাদার রোযার কথা ভুলে গিয়ে পানাহার করলে তার রোযা নষ্ট হবে না। তবে রোযা স্মরণ হওয়ামাত্রই পানাহার ছেড়ে দিতে হবে।

হাদীস শরীফে এসেছে-

من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.

'যে ব্যক্তি ভুলে আহার করল বা পান করল সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে। কারণ আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।'-সহীহ মুসলিম ১/২০২; আলবাহরুর রায়েক ২/২৭১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০২

২)মাসআলা : চোখে ওষুধ-সুরমা ইত্যাদি লাগালে রোযার কোনো ক্ষতি হয় না।

আনাস রা. রোযা অবস্থায় সুরমা ব্যবহার করতেন।-সুনানে আবু দাউদ ১/৩২৩; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৩; রদ্দুল মুহতার ২/৩৯৫

৩)মাসআলা : রাত্রে স্ত্রীসহবাস করলে বা স্বপ্নদোষ হলে সুবহে সাদিকের আগে গোসল করতে না পারলেও রোযার কোনো ক্ষতি হবে না। তবে কোনো ওযর ছাড়া, বিশেষত রোযার হালতে দীর্ঘ সময় অপবিত্র থাকা অনুচিত।

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গোসল ফরয অবস্থায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকাল হত। অতঃপর তিনি গোসল করে রোযা পূর্ণ করতেন।

৪)মাসআলা : বীর্যপাত ঘটা বা সহবাসে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে স্ত্রীকে চুমু খাওয়া জায়েয। তবে কামভাবের সাথে চুমু খাওয়া যাবে না। আর তরুণদের যেহেতু এ আশঙ্কা থাকে তাই তাদের বেঁচে থাকা উচিত।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. বলেন, আমরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে ছিলাম। ইতিমধ্যে একজন যুবক এল এবং প্রশ্ন করল, আল্লাহর রাসূল! আমি কি রোযা অবস্থায় চুম্বন করতে পারি? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। এরপর এক বৃদ্ধ এল এবং একই প্রশ্ন করল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ। আমরা তখন অবাক হয়ে একে অপরের দিকে তাকাচ্ছিলাম। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি জানি, তোমরা কেন একে অপরের দিকে তাকাচ্ছ। শোন, বৃদ্ধ ব্যক্তি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।-মুসনাদে আহমদ ২/১৮০, ২৫০

আবু মিজলায রাহ. বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর নিকট এক বৃদ্ধ রোযা অবস্থায় চুমু খাওয়ার মাসআলা জিজ্ঞাসা করল। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর এক যুবক এসে একই মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে নিষেধ করলেন।-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক ৪/১৮৫; খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৬০; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০০

৫)মাসআলা : অনিচ্ছাকৃত বমি হলে (মুখ ভরে হলেও) রোযা ভাঙ্গবে না। তেমনি বমি মুখে এসে নিজে নিজে ভেতরে চলে গেলেও রোযা ভাঙ্গবে না।

হাদীস শরীফে আছে, অর্থ : অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো ব্যক্তির বমি হলে তার রোযা কাযা করতে হবে না।-জামে তিরমিযী ১/১৫৩, হাদীস : ৭২০; আলবাহরুর রায়েক ২/২৭৪; রদ্দুল মুহতার ২/৪১৪

৬)মাসআলা : শরীর বা মাথায় তেল ব্যবহার করলে রোযা ভাঙ্গবে না।

কাতাদাহ রাহ. বলেন, 'রোযাদারের তেল ব্যবহার করা উচিত, যাতে রোযার কারণে সৃষ্ট ফ্যাকাশে বর্ণ দূর হয়ে যায়।-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক ৪/৩১৩; আদ্দুররুল মুখতার ২/৩৯৫; আলবাহরুর রায়েক ২/১৭৩

৭)মাসআলা : শুধু যৌন চিন্তার কারণে বীর্যপাত হলে রোযা ভাঙ্গবে না। তবে এ কথা বলাই বাহুল্য যে, সব ধরনের কুচিন্তা তো এমনিতেই গুনাহ আর রোযার হালতে তো তা আরো বড় অপরাধ।-ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৪; রদ্দুল মুহতার ২/৩৯৬

* কামভাবের সাথে কোনো মহিলার দিকে তাকানোর ফলে কোনো ক্রিয়া-কর্ম ছাড়াই বীর্যপাত হলে রোযা ভাঙ্গবে না। তবে রোযা অবস্থায় স্ত্রীর দিকেও এমন দৃষ্টি দেওয়া অনুচিত। আর অপাত্রে কু-দৃষ্টি তো গুনাহ। যা রোযা অবস্থায় আরো ভয়াবহ। এতে ঐ ব্যক্তি রোযার ফযীলত ও বরকত থেকে মাহরূম হয়ে যায়।

জাবির ইবনে যায়েদকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর দিকে কামভাবের সাথে তাকানোর ফলে বীর্যপাত ঘটেছে, তার কি রোযা ভেঙ্গে গেছে? তিনি বললেন, 'না। সে রোযা পূর্ণ করবে।'-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৬-২৫৯ আরো দেখুন : সহীহ বুখারী ১/২৫৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৪; ফাতাওয়া শামী ২/৩৯৬

৮)মাসআলা : মশা-মাছি, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি অনিচ্ছাকৃত পেটের ভেতর ঢুকে গেলেও রোযা ভাঙ্গবে না।

* অনুরূপ ধোঁয়া বা ধুলোবালি অনিচ্ছাকৃতভাবে গলা বা পেটের ভেতর ঢুকে গেলে রোযা ভাঙ্গবে না।

আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. বলেন, 'কারো গলায় মাছি ঢুকে গেলে রোযা ভাঙ্গবে না।'-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৬/৩৪৯; রদ্দুল মুহতার ২/৩৯৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৩

৯)মাসআলা : স্বপ্নদোষ হলে রোযা ভাঙ্গবে না।

আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ ভরে বমি হল। তিনি তখন বললেন-

ثلاث لا يفطرن الصائم : القيء، والحجامة، والحلم.

তিন বস্তু রোযাভঙ্গের কারণ নয় : বমি, শিঙ্গা লাগানো ও স্বপ্নদোষ।-সুনানে কুবরা, বাইহাকী ৪/২৬৪

১০)মাসআলা : চোখের দু' এক ফোটা পানি মুখে চলে গেলে রোযার ক্ষতি হয় না। তবে তা যদি গলার ভেতর চলে যায় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।-আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৪৯; ফাতাওয়া হিনিদয়া ১/২০৩

মাসআলা : সুস্থ অবস্থায় রোযার নিয়ত করার পর যদি অজ্ঞান বা অচেতন হয়ে যায় তাহলে রোযা নষ্ট হবে না।

নাফে রাহ. বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. নফল রোযা অবস্থায় বেহুশ হয়ে যান কিন্তু এ কারণে রোযা ভাঙ্গেননি।-সুনানে কুবরা, বাইহাকী ৪/২৩৫; আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৬৮; মাবসূত, সারাখসী ৩/৮৮

যাদের জন্য রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে

১. মুসাফির

মাসআলা : মুসাফিরের জন্য সফরের হালতে রোযা না রাখার সুযোগ রয়েছে। তবে অস্বাভাবিক কষ্ট না হলে রোযা রাখাই উত্তম। আর অস্বাভাবিক কষ্ট হলে রোযা রাখা মাকরূহ। এ অবস্থায় রোযা না রেখে পরে তা কাযা করবে।

আছিম রাহ. বলেন, আনাস রা.কে সফরকালে রোযা রাখার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'যে রোযা রাখবে না সে অবকাশ গ্রহণ করল। আর যে রোযা রাখল সে উত্তম কাজ করল।'-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৬/১৩২; রদ্দুল মুহতার ২/৪২১; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৪০৩

মাসআলা : সফরের হালতে রোযা রাখা শুরু করলে তা আর ভাঙ্গা জায়েয নয়। কেউ ভেঙ্গে ফেললে গুনাহগার হবে। তবে কাফফারা আসবে না। শুধু কাযাই যথেষ্ট।

আনাস রা. বলেন, 'কেউ রোযা রেখে সফরে বের হলে রোযা ভাঙ্গবে না। তবে যদি পিপাসার কারণে প্রাণনাশের আশঙ্কা হয় তাহলে রোযা ভাঙ্গতে পারবে, পরে তা কাযা করে নিবে।-ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৪০৩; রদ্দুল মুহতার ২/৪৩১

মাসআলা : মুসাফির সফরের কারণে রোযা রাখেনি, কিন্তু দিন শেষ হওয়ার আগেই মুকীম হয়ে গেল। তাহলে দিনের অবশিষ্ট সময় রমযানের মর্যাদা রক্ষার্থে পানাহার থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। তবে পরবর্তী সময়ে এ রোযার কাযা অবশ্যই করতে হবে।

ইবরাহীম নাখায়ী রাহ. বলেন, যে মুসাফির রমযানের দিনে (সফরের হালতে) খানা খেয়েছে সে মুকীম হয়ে গেলে দিনের বাকি অংশ পানাহার থেকে বিরত থাকবে।-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৬/২২১; আলবাহরুর রায়েক ২/২৯১; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৪২৮

মাসআলা : রমযানের দিনে হায়েয-নেফাস থেকে পবিত্র হলে অবশিষ্ট দিন রমযানের মর্যাদা রক্ষার্থে পানাহার থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। তবে উক্ত ওযরে ছুটে যাওয়া রোযাগুলোর সাথে এ দিনের রোযাও কাযা করবে।

হাসান রা. বলেন, 'সুবহে সাদিকের পর যে হায়েয থেকে পবিত্র হয়েছে সে দিনের বাকি অংশে পানাহার করবে না।'-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ৬/২২১; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৪২৮; আলবাহরুর রায়েক ২/২৯১

২. অসুস্থ ব্যক্তি

মাসআলা : রোযার কারণে যে রোগ বৃদ্ধি পায় বা রোগ-ভোগ দীর্ঘ হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে সে রোগে রোযা ভাঙ্গার অবকাশ আছে। উল্লেখ্য, আশঙ্কা যদি সুস্পষ্ট হয় তাহলে তো কথা নেই। নতুবা একজন অভিজ্ঞ ও দ্বীনদার চিকিৎসকের মতামতের প্রয়োজন হবে।-আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৫৯; আদ্দুররুল মুখতার ২/৪২২

৩. গর্ভবতী

মাসআলা : রোযা রাখার কারণে গর্ভবতী মহিলা নিজের কিংবা সন্তানের প্রাণহানী বা মারাত্মক স্বাস্থ্যহানীর প্রবল আশঙ্কা করলে তার জন্য রোযা ভঙ্গ করা জায়েয। পরে এ রোযা কাযা করে নিবে।-আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৫৯; আদ্দুররুল মুখতার ২/৪২২

৪. দুগ্ধদানকারিনী

মাসআলা : দুগ্ধদানকারিনী মা রোযা রাখলে যদি সন্তান দুধ না পায় আর ঐ সন্তান অন্য কোনো খাবারেও অভ্যস্ত না হয়, ফলে দুধ না পাওয়ার কারণে

সন্তানের মৃত্যুর বা মারাত্মক স্বাস্থ্যহানীর আশঙ্কা হয়, তাহলে তিনি রোযা ভাঙ্গতে পারবেন এবং পরে কাযা করে নিবেন। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, অর্থ : আল্লাহ তাআলা মুসাফিরের জন্য রোযার হুকুম শিথিল করেছেন এবং আংশিক নামায কমিয়ে দিয়েছেন। আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিনীর জন্যও রোযার হুকুম শিথিল করেছেন।-জামে তিরমিযী ১/১৫২; আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৫৯; আদ্দুররুল মুখতার ২/৪২২

৫.দুর্বল বৃদ্ধ ব্যক্তি

মাসআলা : বার্ধক্যজনিত কারণে রোযা রাখতে সক্ষম না হলে রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে একজন গরীবকে দুবেলা খাবার খাওয়াবে অথবা পৌনে দু কেজি গমের মূল্য সদকা করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

আর যাদের রোযা রাখা অত্যন্ত কষ্টকর তারা ফিদয়া-একজন মিসকীনকে খাবার প্রদান করবে।-সূরা বাকারা : ১৮৪; আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৬১; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৭

৬.ফিদয়া

মাসআলা : যে বৃদ্ধ বা অসুস্থ ব্যক্তির রোযা রাখার সামর্থ্য নেই এবং পরবর্তীতে কাযা করতে পারবে এমন সম্ভাবনাও নেই এমন ব্যক্তি রোযার পরিবর্তে ফিদয়া প্রদান করবে।-সূরা বাকারা : ১৮৪

ছাবেত বুনানী রাহ. বলেন, আনাস ইবনে মালেক রা. যখন বার্ধক্যের কারণে রোযা রাখতে সক্ষম ছিলেন না তখন তিনি রোযা না রেখে (ফিদয়া) খাবার দান করতেন।-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস : ৭৫৭০

ইকরিমা রাহ. বলেন, ''আমার মা প্রচন্ড তৃষ্ণা-রোগে আক্রান্ত ছিলেন এবং রোযা রাখতে সক্ষম ছিলেন না। তাঁর সম্পর্কে আমি তাউস রাহ.কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, 'প্রতি দিনের পরিবর্তে মিসকীনকে এক মুদ (বর্তমান হিসাবে পৌনে দুই কেজি) পরিমাণ গম প্রদান করবে'।''-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস : ৭৫৮১

মাসআলা : এক রোযার পরিবর্তে এক ফিদয়া ফরয হয়। এক ফিদয়া হল, কোনো মিসকীনকে দু বেলা পেট ভরে খানা খাওয়ানো অথবা এর মূল্য প্রদান করা।

হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যিব রাহ. বলেন-

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

এই আয়াত রোযা রাখতে অক্ষম বৃদ্ধের জন্য প্রযোজ্য।-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস : ৭৫৮৫; আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৬৯; আদ্দুররুল মুখতার ২/৪২৬

মাসআলা : যাদের জন্য রোযার পরিবর্তে ফিদইয়া দেওয়ার অনুমতি রয়েছে তারা রমযানের শুরুতেই পুরো মাসের ফিদয়া দিয়ে দিতে পারবে।-আদ্দুররুল মুখতার ২/৪২৭; আলবাহরুর রায়েক ২/২৮৭

মাসআলা : উপরোক্ত দুই শ্রেণীর মানুষ ছাড়া (অর্থাৎ দুর্বল বৃদ্ধ ও এমন অসুস্থ ব্যক্তি যার ভবিষ্যতে রোযার শক্তি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।) আরো যাদের জন্যে রোযা ভাঙ্গা জায়েয আছে, (যেমন-মুসাফির, গর্ভবতী ও শিশুকে

স্তন্যদানকারিনী) তারা রোযা না রাখলে রোযার ফিদয়া দিবে না; বরং পরে কাযা করবে। আর ওযরের হালতে মৃত্যুবরণ করলে কাযা ও ফিদয়া কিছুই ওয়াজিব হবে না। অবশ্য ওযরের হালত শেষ হওয়ার পর, অর্থাৎ মুসাফির মুকীম হওয়ার পর, গর্ভবতী নারীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া ও স্রাব বন্ধ হওয়ার পর এবং

স্তন্যদানকারিনী স্তন্যদান বন্ধ করার পর যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে ওযর শেষে যে কয়দিন সময় পেয়েছে সে কয়দিনের কাযা যিম্মায় আসবে। কাযা না করলে উক্ত দিনগুলির ফিদয়া প্রদানের অসিয়ত করে যেতে হবে।-আদ্দুররুল মুখতার ২/৪২৩-৪২৪; কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদীনাহ ১/২৫৫

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. বলেন, 'গর্ভবতী নারী ও শিশুকে

স্তন্যদানকারিনীর জন্যে রমযানে রোযা না রাখার অবকাশ রয়েছে। তারা ফিদয়া আদায় করবে না; বরং রোযাগুলো কাযা করে নিবে।'-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস : ৭০৬৪

মাসআলা : ছুটে যাওয়া রোযার কাযা সম্ভব না হলে মৃত্যুর পূর্বে ফিদয়া দেওয়ার অসিয়ত করে যাওয়া জরুরি। অসিয়ত না করে গেলে ওয়ারিশরা যদি মৃতের পক্ষ থেকে ফিদয়া দেয় তবে আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাআলা তা কবুল করবেন। তবে মৃতব্যক্তি অসিয়ত না করে গেলে সেক্ষেত্রে মিরাসের ইজমালী সম্পদ থেকে ফিদয়া দেওয়া হবে না। একান্ত দিতে চাইলে বালেগ ওয়ারিশগণ তাদের অংশ থেকে দিতে পারবে।-রদ্দুল মুহতার ২/৪২৪-৪২৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৭

মাসআলা : এক রোযার ফিদয়া একজন মিসকীনকে দেওয়া উত্তম। তবে একাধিক ব্যক্তিকে দিলেও ফিদয়া আদায় হয়ে যাবে। আর একাধিক ফিদয়া এক মিসকীনকে দেওয়া জায়েয।

আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. বলেন, 'যে বৃদ্ধ রোযা রাখতে সক্ষম নন তিনি রোযা না রেখে প্রতি দিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে আধা সা' (অর্থাৎ প্রায় পৌনে দুই কেজি) গম দিয়ে দেবেন।-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস : ৭৫৭৪; আলবাহরুর রায়েক ২/৮৭; আদ্দুররুল মুখতার ২/৪২৭

রোযা মাকরূহ হওয়ার কারণসমূহ

মাসআলা : রোযা অবস্থায় কুলি করার সময় গড়গড়া করা এবং নাকের নরম অংশ পর্যন্ত পানি পৌঁছানো মাকরূহ।

লাকিত ইবনে সবিরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

بالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائما.

(অযু-গোসলের) সময় ভালোভাবে নাকে পানি দাও, তবে রোযাদার হলে নয়।-জামে তিরমিযী, হাদীস: ৭৬৬; সুনানে আবু দাউদ ১/৩২২; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস : ৯৮৪৪; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/৩৯৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৯৯

মাসআলা : রোযা অবস্থায় শরীর থেকে রক্ত বের হলে বা ইনজেকশন ইত্যাদি দ্বারা রক্ত বের করলে রোযা ভাঙ্গবে না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে এ পরিমাণ রক্ত বের করা মাকরূহ, যার দ্বারা রোযাদার খুব দুর্বল হয়ে যায়।

সাবেত আলবুনানী রাহ. বলেন, আনাস রা. কে জিজ্ঞাসা করা হল রোযার হালতে শিঙ্গা লাগানোকে আপনারা কি মাকরূহ মনে করতেন? তিনি বলেন, 'না। তবে এ কারণে দুর্বল হয়ে পড়লে তা মাকরূহ হবে।'-সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯৪০; আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৫৬; রদ্দুল মুহতার ২/৩৯৫

মাসআলা : রোযার হালতে গীবত করলে, গালি-গালাজ করলে, টিভি-সিনেমা ইত্যাদি দেখলে, গান-বাদ্য শ্রবণ করলে এবং যে কোনো বড় ধরনের গুনাহে লিপ্ত হলে রোযা মাকরূহ হয়ে যায়। আর এ কাজগুলো যে সর্বাবস্থায় হারাম, তা তো বলাই বাহুল্য।

হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب.

'তোমাদের কেউ যখন রোযা রাখে তখন সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং শোরগোল, হট্টগোলে লিপ্ত না হয়।-সহীহ বুখারী হাদীস : ১৯০৪;

সুনানে আবু দাউদের রেওয়ায়েতে এ শব্দ রয়েছে, 'রোযাদার যেন কোনো অন্যায়-অপরাধে লিপ্ত না হয়।' হাদীস : ৩৩৬৩ (১/৩২২)

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা-প্রতারণা ও গুনাহের কাজ ত্যাগ করে না আল্লাহ তাআলার নিকট তার পানাহার থেকে বিরত থাকার কোনো মূল্য নেই।'-সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯০৩; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৩৩৬২ (১/৩২২)

যেসব কাজ রোযাদারের জন্য মাকরূহ নয়

মাসআলা : রোযার হালতে প্রয়োজনে জিহবা দ্বারা কোনো কিছুর স্বাদ নেওয়া বা প্রয়োজনে বাচ্চাদের জন্য খাদ্য চিবানো মাকরূহ নয়। তবে সতর্ক থাকতে হবে, যেন স্বাদ গলার ভেতরে চলে না যায়।

ইবরাহীম নাখায়ী রাহ. রোযাদার মহিলা বাচ্চার জন্য খাদ্য চিবানোকে দোষের বিষয় মনে করতেন না।-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক ৪/২০৭; আলমুহীতুল বুরহানী ৩/৩৫৬; রদ্দুল মুহতার ২/৪১৬

মাসআলা : রোযাদারের জন্য সুরমা লাগানো বা সুগন্ধি ব্যবহার করা মাকরূহ নয়।

আতা রাহ. বলেন, 'রোযাদারের জন্য সুরমা ব্যবহার করাতে দোষ নেই।'-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক ৪/২০৮; আলবাহরুর রায়েক ২/২৮০

মাসআলা : রোযা অবস্থায়ও মিসওয়াক করা সুন্নত। এমনকি কাঁচা ডাল দ্বারা মিসওয়াক করাও মাকরূহ নয়।

আমির ইবনে রবীয়া রা. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি রোযার হালতে অসংখ্যবার মিসওয়াক করতে দেখেছি।-সহীহ বুখারী ১/২৫৯; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক ৪/২০০

হাসান রাহ.কে রোযা অবস্থায় দিনের শেষে মিসওয়াক করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'রোযা অবস্থায় দিনের শেষে মিসওয়াক করতে কোনো অসুবিধা নেই। মিসওয়াক পবিত্রতার মাধ্যম। অতএব দিনের শুরুতে এবং শেষেও মিসওয়াক করো।'-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক ৪/২০২

ইবরাহীম রাহ. বলেন, 'রোযা অবস্থায় দিনের শুরু ও শেষে মিসওয়াক করতে কোনো অসুবিধা নেই।'-প্রাগুক্ত ৪/২০৩

মুজাহিদ রাহ. রোযা অবস্থায় তাজা মিসওয়াক ব্যবহার করাকে দোষণীয় মনে করতেন না। সুফিয়ান সাওরী রাহ. থেকেও অনুরূপ বক্তব্য বর্ণিত আছে।-প্রাগুক্ত ৪/২০২; রদ্দুল মুহতার ২/৪১৯; আলবাহরুর রায়েক ২/ ২৮১

রামাযানের গুরুত্ব :

'ছিয়াম' ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি।[2] ধনী-গরীব সকল প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমের উপর রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করা ফরয। একজন মানুষের সুন্দর ও স্বচ্ছভাবে জীবন যাপনের জন্য যে ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার, ছিয়াম তার মধ্যে সে ধরনের গুণ-বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে থাকে। এ মাসে বান্দার জন্য আল্লাহর রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করা হয় এবং বান্দার ইবাদতে বাধা প্রদানকারী শয়তানকে বেঁধে রাখা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ- وَفِيْ رِوَايَةٍ :فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ- وَفِيْ رِوَايَةٍ :فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ-

‘যখন রামাযান মাস আগমন করে তখন আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়। অন্য বর্ণনায় আছে, জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করা হয় এবং শয়তানদেরকে শৃঙ্খলিত করা হয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রহমতের দ্বার সমূহ খুলে দেয়া হয়’।[3]

তিনি আরও বলেন,

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِيْ مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ-

‘যখন রামাযান মাসের প্রথম রাত্রি আসে, তখন শয়তান ও অবাধ্য জিনগুলোকে শৃঙ্খলিত করা হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয়, অতঃপর উহার কোন দরজাই খোলা হয় না এবং জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয়, অতঃপর উহার কোন দরজাই আর বন্ধ করা হয় না। এ মাসে এক আহবানকারী আহবান করতে থাকেন, হে কল্যাণের অভিযাত্রীরা! অগ্রসর হও। হে অকল্যাণের অভিসারীরা! বিরত হও। আল্লাহ তা‘আলা এই মাসে বহু ব্যক্তিকে জাহান্নাম হ’তে মুক্তি দেন। আর তা (মুক্তি দেয়া) প্রত্যেক রাত্রিতেই হয়ে থাকে’।[4]

‘ছিয়াম’ মানুষকে সকল প্রকার অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الصِّيَامُ جُنَّةٌ ‘ছিয়াম ঢাল স্বরূপ’।[5] শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, والمراد أنه حجاب وحصن للصائم من المعاصى. ‘ঢাল দ্বারা উদ্দেশ্য হ’ল- ছিয়াম পাপাচার থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে ছায়েমের জন্য পর্দা ও রক্ষাকবচ’।[6] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যখন তোমাদের কারো ছিয়াম পালনের সময় হবে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং ঝগড়া না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় কিংবা তার সাথে লড়াই করে, তাহ’লে সে যেন বলে, আমি ছায়েম’।[7]

মানুষের জন্য ছিয়াম পালনের গুরুত্ব রয়েছে বলেই আল্লাহ তা‘আলা উম্মতে মুহাম্মাদী সহ পূর্ববর্তী উম্মতের জন্যও তা ফরয করে দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ- ‘হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা মুত্তাক্বী হ’তে পার’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ‘তোমাদের মধ্যে যে এ মাসকে পায় সে যেন ছিয়াম রাখে’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

রামাযানের ছিয়ামের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা প্রতি বছর মুসলমানদের ঈমানের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। এই পরীক্ষায় যখন মানুষ উত্তীর্ণ হয়, তখন তার মধ্যে আল্লাহকে ভয় করার ও যাবতীয় গোনাহ হ’তে বিরত থাকার যোগ্যতা অধিক পরিমাণে বেড়ে যায়। তখন সে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব কিছুই আল্লাহ জানেন ও দেখেন মনে করে গোপনেও আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে পারে না। যে ব্যক্তি প্রকৃত ছিয়ামপালনকারী সে তীব্র গরমের সময় কলিজা ফেটে যেতে চাইলেও এক ফোটা পানি পান করে না। অসহ্য ক্ষুধার জ্বালায় শরীর দুর্বল হ’লেও সামান্য খাদ্য মুখে দেয় না। এত ত্যাগ, ধৈর্য স্বীকার করে ছিয়াম পালন করা একমাত্র আল্লাহর জন্যই

হয়ে থাকে। তাই এর প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ দিবেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, فَإِنَّهُ لِيْ وَ أَنَا أَجْزِيْ بِهِ. ‘নিশ্চয়ই ছিয়াম আমার জন্য এবং আমি নিজেই তার প্রতিদান দিব’।[8]

এছাড়াও রামাযানের আরও কিছু গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

1. সামগ্রিক কল্যাণ : ইসলামে ছিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক ও শারীরিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে ছিয়ামের প্রভাব অতিশয় কার্যকর । আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَأَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ- ‘আর তোমাদের ছিয়াম পালন করা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৪)*।

২. কুরআন নাযিলের মাস : পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার কারণে এ মাসে ছিয়ামের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন, ‘রামাযান মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে আল-কুরআন। যা মানুষের হেদায়াত এবং সৎপথের সুস্পষ্ট নির্দেশ ও সত্য- মিথ্যার পার্থক্যকারী। সুতরাং যে ব্যক্তি রামাযান মাস পায় সে যেন ছিয়াম পালন করে’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

রামাযানের তাৎপর্য :

রামাযান শব্দের শাব্দিক অর্থ দহন বা দগ্ধকরণ। রামাযান মাস মুসলমানদের মাঝে তাদের সমস্ত পাপ মোচন করার জন্য আসে। কারণ মানব জীবনের দু’টি ধারা রয়েছে- সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি। সুপ্রবৃত্তি আমাদের সমাজ জীবনে ঐক্য-সংহতি, প্রেম-মৈত্রী ও ভালবাসা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। অপরদিকে কুপ্রবৃত্তি আমাদেরকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, একক ও অসহায় করে তোলে। এভাবে ক্রোধ মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে তোলে। লোভ, মোহ প্রভৃতি সামাজিক জীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। ফলে এগুলোর দহনের জন্যই এ দুনিয়ায় আল্লাহ রামাযানের প্রবর্তন করেছেন, যাতে এ দহনের ফলে মানুষ এ বিশ্বে তার প্রকৃত স্থান নির্দিষ্ট করতে পারে; সে যাতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

কুরআনুল কারীমে ও ছহীহ হাদীছে এজন্যই ছিয়ামের এত মাহাত্ম্য ঘোষণা করা হয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিতেও এর ফযীলত ও কার্যকারিতার মর্ম উপলব্ধি করা যায়। এক্ষেত্রে ধনী ও নির্ধন এক সারিতে চলে আসে। সারা বৎসর যারা ধনীদের দ্বারে হাত পেতে কষ্টে দিনাতিপাত করেছে তারা যেমন ছিয়াম পালন করে, যারা নানাবিধ চর্বচোষ্য, লেহ্য ও পেয় খাদ্য-পানীয় দ্বারা রসনার তৃপ্তি সাধন করে, তারাও অন্ন ও সংস্থান থাকা সত্ত্বেও ছিয়াম পালন করে। এখানে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এটিই মানবতার মৌলিক ঐক্য।

এ মাসে কাম প্রবৃত্তির পরিচর্যা, লোভের বশীভূত হয়ে অন্যের জিনিসের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত, হিংসা-বিদ্বেষ বর্জনীয়। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যেসব আবর্জনা আমাদের মানসে সঞ্চিত হয়ে তাকে আবিল করে তোলে, তা থেকে পবিত্রাণের মাধ্যম হচ্ছে এই ছিয়াম। ছিয়ামের অর্থ

কেবল উপবাস থাকা নয়; বরং সকল প্রকার কামনা-বসনা, সুখ-সম্ভোগ ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার নাম ছিয়াম।

আল্লাহ প্রদত্ত অফুরন্ত কল্যাণ লাভের ক্ষেত্রেও রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ- 'সেই ব্যক্তির নাক মাটিতে মিশে যাক, যে রামাযান পেল, অথচ নিজেকে ক্ষমা করে নিতে পারল না'।[9]

রামাযানের শিক্ষা

ভ্রাতৃত্ব : রামাযান আগমন করে আমাদের জীবনের পরিশুদ্ধির জন্য। এ মাস আমাদেরকে ধনী ও গরীবের মাঝে সমতা ও ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা দেয়। আমরা সকলে যে একই আদমের সন্তান তা এ মাসে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। এ মাসে আমরা সকলে একই বিধান পালন করি এবং একে অপরের মধ্যেকার ভেদাভেদ ভুলে ভাই ভাই হয়ে যাই। The Cultural History of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে "The fasting of Islam has a wonderful teaching for establishing social unity, brotherhood and equity. It has also an excellant teaching for building a good moral character. 'সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ছিয়ামে রয়েছে এক অভাবনীয় শিক্ষা। রয়েছে উত্তম নৈতিক চরিত্র গঠনের এক চমৎকার শিক্ষা'। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

'হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের পতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হ'তে সৃষ্টি করেছেন ও তা হ'তে তদীয় সহধর্মিণী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হ'তে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর সেই আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের যাঞ্ছা করে থাক এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহই তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী' *(নিসা ৪/১)*।

সকল মানুষ এক আত্মা থেকে জন্ম নিয়েছে ফলে তারা একে অপরের ভাই ভাই এবং এই ভ্রাতৃত্বের বহিঃপ্রকাশের জন্য দীর্ঘ এক বছর পর আমাদের সামনে আগমন করে রামাযান মাস। এই মাসে হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে সবাই ভ্রাতৃত্ব বজায় রেখে চলে এবং এক মনে ইবাদতে সময় ব্যয় করে।

আত্মসংযম : মানুষের মধ্যে পাপ প্রবণতা বা নিষিদ্ধ কর্মের দিকে ঝোঁক বেশী। আরবী প্রবাদ রয়েছে, اَلْإِنْسَانُ حَرِيْصٌ فِيْمَا مُنِعَ 'মানুষ নিষিদ্ধ কাজের প্রতি বেশী আগ্রহী হয়'। আল্লাহকে ভয় করার মাধ্যমে ছিয়াম মানুষকে সম্পূর্ণরূপে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে প্রশিক্ষণ দেয়।

কেননা ছায়েম ছিয়ামরত অবস্থায় কোন পাপ কাজে লিপ্ত হ’লে তার ছিয়ামের কোন মূল্য নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِيْ أَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

‘যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও পাপাচার পরিহার করল না, তার পানাহার পরিহার করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই’।[10] আলী (রাঃ) বলেন, إن الصيام ليس من الطعام والشراب ولكن من الكذب والباطل واللغو. ‘খাদ্য-পানীয় থেকে বিরত থাকার নামই ছিয়াম নয়; বরং মিথ্যা, বাজে কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকার নামই প্রকৃত ছিয়াম’।[11]

তাক্বওয়ার অনুশীলন : তাক্বওয়া লাভের জন্য ছিয়ামের কোন বিকল্প নেই। পাপাচার ও ভীতিপ্রদ বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করার নাম তাক্বওয়া। রামাযান মাসে এই সকল পাপ থেকে নিজেকে দূরে রাখার প্রচেষ্টা সকল ছায়েম করে থাকে। ফলে এই মাসে ছিয়ামের মাধ্যমে তাক্বওয়ার অনুশীলন বেশী হয়।

প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ : মানুষ স্বভাবতই তাক্বওয়াহীনতা ও গর্হিত কর্মে জড়িয়ে পড়ে। আর রামাযান এই সমস্ত প্রবৃত্তিমূলক কাজ-কর্ম থেকে ছায়েমকে মুক্ত রাখে। আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘(ক্বিয়ামতের দিন) ছিয়াম ও কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। ছিয়াম বলবে, হে প্রভু! আমি তাকে দিনে খাদ্য গ্রহণ ও সহবাস থেকে বিরত রেখেছি। কাজেই তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন! কুরআন বলবে, আমি তাকে রাত্রিতে ঘুমানো থেকে নিবৃত্ত করেছি। অতএব তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। তখন তাদের দু’জনেরই সুপারিশ গ্রহণ করা হবে’।[১২] ফলে এই সমস্ত প্রবৃত্তিমূলক কাজ-কর্ম বর্জনের মাধ্যমে রামাযান মাসে প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের অনুশীলন করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, পাপ-পংকিলতামুক্ত, আত্মনিয়ন্ত্রিত জীবন গঠনে ছিয়ামের কোন বিকল্প নেই। রামাযানের মাসব্যাপী ছিয়াম সাধনার মাধ্যমে প্রকৃত মুমিন তৈরী হ’লে সমাজ, দেশ, জাতি উপকৃত হবে এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনে সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন- আমীন!!

[1]. *ক্বামূস, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৯০।*

[2]. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪।*

[3]. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৬ ‘ছওম’ অধ্যায়।*

[4]. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, শু‘আবুল ঈমান হা/৩৫৯৮; মিশকাত হা/১৯৬০।*

[5]. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৪৯।*

[6]. *ঐ, ১/৬১১, টীকা-২ দ্রঃ।*

[7]. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/১৯৫৯।*

[8]. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৯।*

[9]. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৯২৭ ‘ছালাত’ অধ্যায়।*

[10]. *বুখারী, মিশকাত হা/১৯৯৯।*

[11]. *শু'আবুল ঈমান ৩/৩১৭, হা/৩৬৪৮।*
১২. *বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৯৬৩।*

উপসংহার:

মহান আল্লাহ মারয়্যাম (আঃ)-এর ইতিহাস উল্লেখ করে বলেন,

(فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيّاً)

অর্থাৎ, (সন্তান ভূমিষ্ঠ করার পর) যদি তুমি কাউকে (কোন প্রশ্ন বা কৈফিয়ত করতে) দেখ, তবে তুমি বল, 'আমি দয়াময় (আল্লাহর) জন্য (কথা বলা থেকে) বিরত থাকার নযর মেনেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথাই বলব না।' (কুরআনুল কারীম ১৯/২৬) বলা বাহুল্য, এখানে 'সওম'-এর অর্থ হল কথা বলা থেকে বিরত থাকা।

শরীয়তের পরিভাষায় 'সওম' বা 'সিয়াম'-এর অর্থ হল, ফজর উদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, স্ত্রী-সঙ্গম ইত্যাদি যাবতীয় রোযা নষ্টকারী কর্ম হতে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা।[1]

অবশ্য এই সংজ্ঞায় অসারতা ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকাও শামিল রয়েছে। কারণ, প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ''কেবল পানাহার থেকে বিরত থাকার নামই সিয়াম নয়; বরং অসারতা ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকার নামই হল (আসল) সিয়াম। সুতরাং যদি তোমাকে কেউ গালাগালি করে অথবা তোমার প্রতি মূর্খতা প্রদর্শন করে, তাহলে তুমি (তার প্রতিশোধ না নিয়ে) তাকে বল যে, 'আমি রোযা রেখেছি, আমি রোযা রেখেছি।''[2]

'রোযা' আভিধানিক অর্থে সিয়ামের সমার্থবোধক না হলেও পারিভাষিক অর্থে ফারসী, উর্দু, হিন্দী ও বাংলা ভাষায় সিয়ামের জায়গায় 'রোযা' শব্দটি ব্যবহার হয় বলেই সাধারণ জনসাধারণের বুঝার সুবিধার্থে আমিও এই পুস্তিকায় রোযা শব্দই প্রয়োগ করেছি। আর এ ব্যবহারে শরীয়তগত কোন ক্ষতি নেই।

[1] (আশশারহুল মুমতে' ৬/৩১০, তাযঃ ৯পৃঃ)

[2] (হাকেম, মুস্তাদ্রাক, বাইহাকী, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ, ইবনে হিববান, সহীহ, সহীহুল জামেইস সাগীর, আলবানী ৫৩৭৬নং)

পূর্ববর্তী ধর্মমতে রোযা

মানুষের জন্য রমাযানের রোযাই প্রথম রোযা নয়। কারণ, রোযা হল এমন ইবাদত, যা আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টির পর থেকেই নিজের বান্দার জন্য ফরয করেছেন। তিনি কুরআন মাজীদে বলেন,

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হল, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের উপর ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা পরহেযগার হতে পার। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৩)

এ থেকে বুঝা যায় যে, পূর্ববর্তী সকল উম্মতের জন্য রোযা ফরয ছিল। অবশ্য ইসলাম, খ্রিষ্টান ও ইয়াহুদী ধর্মের পূর্বের ধর্মাবলম্বী মানুষরা কিভাবে কোন্ পদ্ধতিতে রোযা পালন করত, তা নির্দিষ্টরূপে জানা যায় না। তবে ইয়াহুদ ও খ্রিষ্টানরা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জিনিস থেকে বিরত থেকে রোযা পালন করত। তাওরাত ও ইঞ্জীলের বর্তমান সংস্কারগুলো থেকেও জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলা রোযাকে তাঁর পূর্ববর্তী বান্দাদের উপর ফরয করেছিলেন।